চৈত্রসংক্রান্তির আগে

প্রশান্ত মৃধা

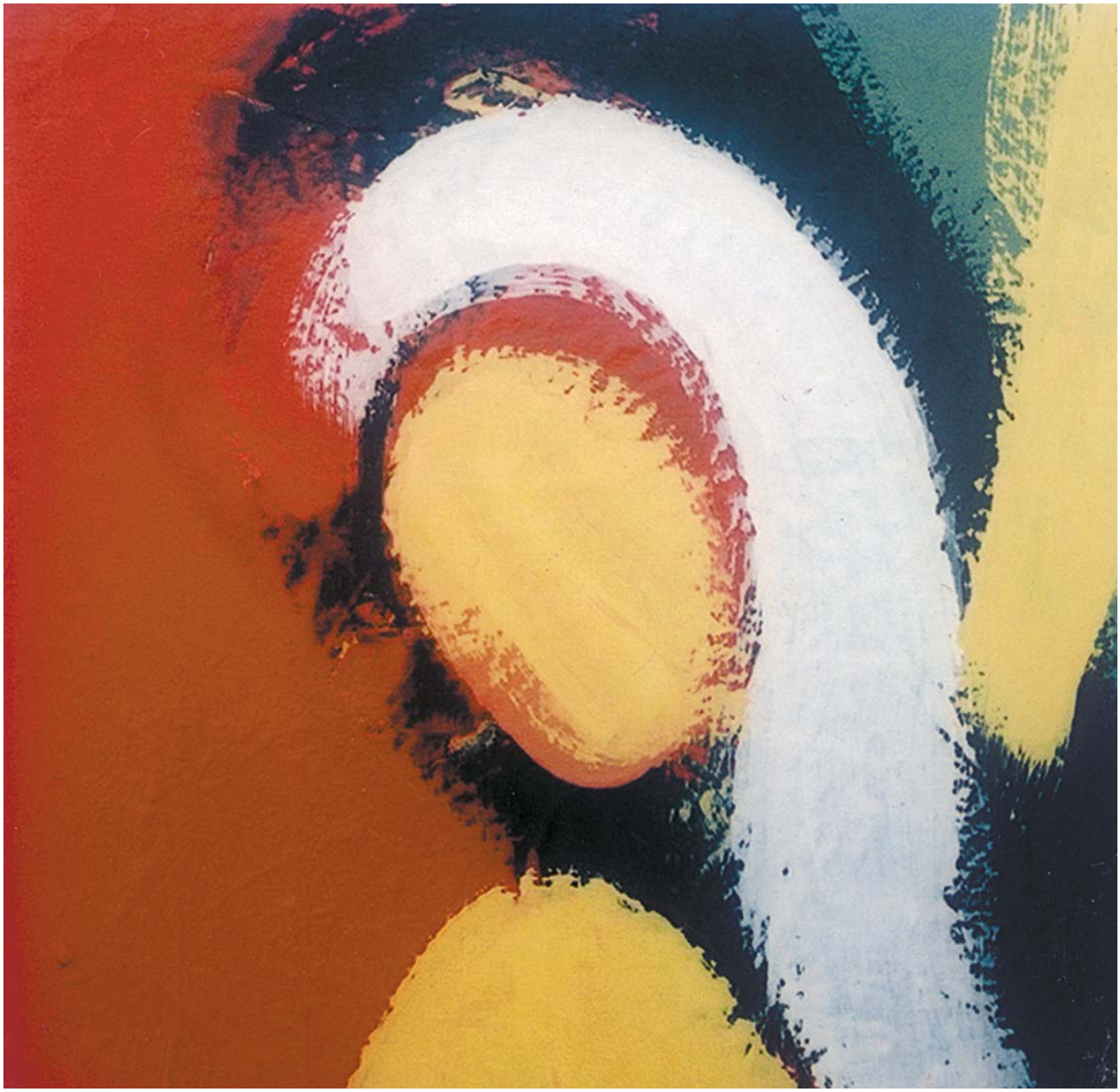

'তলে কী লেকপো?' এতক্ষণ পূর্ণিমা যে কোন জগতে ছিল তা খুঁজে দেখতে হবে। মেজোমাসির বর প্রফুল্ল এক থোকা গোলাপ আর এর চারপাশে ডাল ও পাতা তুলে আঁকা শেষ করে এনে যখন পূর্ণিমার কাছে তলে অর্থাৎ ফুল ও ডালপালার নিচে কী লিখবে জানতে চেয়েছে ততক্ষণ পূর্ণিমা গোলাপের ভিতরে চোখ দিয়ে মেসো কী লিখবে তাই খুঁজছিল।

সেই শব্দটা একটা নাম, পূর্ণিমা জানে। মেসোকে ফুলের নিচে কী লিখতে বলবে তা সে ঘর থেকে খাতা নিয়ে আসার সময় ভেবে রেখেছিল। কিন্তু এখন মেসোর সামনে সেই নাম বলে কীভাবে? উঠানে প্রফুল্লর বসা চেয়ারের পিছনে বামপাশে দাঁড়ানো হাসি। প্রফুল্লর জিজ্ঞাসায় হাসির দিকে চেয়ে ঠোঁটচেপে হেসে পূর্ণিমা কাঠ হয়ে যায়। প্রফুল্লর ডান পাশ থেকে সন্তর্পণে বামে হাসির পাশে এসে চেয়ারের হাতলে আলতো হাত রেখে দাঁড়ায়। ফের আড়চোখে হাসির দিকে চায়। ঠোঁট-চেপে হাসে।

হাসির হাতেও খাতা। হাসি খাতা এনেছে একটা ফুল কি লতা কি পাখি কি নৌকা বা 'জাতের মেয়ে কালোও ভালো, নদীর জল ঘোলাও ভালো' মতন একটা কিছু প্রফুল্লকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে। হাসির হাতের খাতা রেখে পূর্ণিমা ভাবে, ওই খাতাটাই আগে দেয়া ভালো ছিল। এখন সে মেসোকে তলে কী লিখতে হবে বলে কীভাবে?

প্রফুল্ল আবার বলে, 'তলে কী লেকপো, ও পুন্নি?'

শব্দটা কিন্তু ঠোঁটেই এনে রেখেছে পূর্ণিমা। সেই শব্দটা ওই ফুল-পাতার তলে লেখা হলেই খাতাটা তার হাতে চলে আসবে। নাকি বলবে, কিছু লিখতে হবে না। তা যদি বলে তাহলে তার আর লাভটা কী? মেসোর মতো অত সুন্দর করে তো সে লিখতে পারবে না। জনমেও না। কিন্তু পূর্ণিমার এই নাম বলার দেরিতে হাসিরও দেরি বুঝে হাসি বলে, 'এ পুন্নি ক, জামাই তলে কী লেকপে।'

হাসি হাসে। পূর্ণিমা ঢোক গেলে। এরপর ওই শক্ত মুখে ঠোঁট-খোলা হাসি নিয়ে বলে, 'সুবাস-

প্রফুল্ল জানতে চায়, 'সুবাস না সুভাষ?'

পূর্ণিমা হাসে, 'সুবাস।' ভাবে, মেসো নিশ্চিত ভেবেছে ফুলের সুবাস। প্রফুল্লও তাই বলে, 'ফুলের সুবাস?'

- 'না, খালি সুবাস লেখেন।'

হাসি হাসে। প্রফুল্ল ফুলের তলে লম্বায় ইঞ্চিখানেক সাইজের অক্ষরে মাঝখান না-ভরে দু'পাশে দাগ দিয়ে লিখে দেয় : সুবাস। পূর্ণিমার চোখের সামনেই ভেলকি লেগে দ্রুত একটানে মুহূর্তে লেখা হয়ে গেল, সুবাস। পূর্ণিমা অবাক তাকিয়ে রয়। প্রফুল্ল খাতাটা বাম হাতে ধরা খাতাটা ডাইন হাতে নিয়ে কনুই ভাঁজ করে পূর্ণিমাকে দিলে সে খাতা হাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরে। তারপর এক ছুটে ঘরে চলে যায়। ঘরে যেয়ে পড়ার বইপত্তরের ভিতরে সে সব কটি খাতার তলে সহজ সচেতনে খাতাটা রেখে প্রায় এক দৌড়ে আবার মেসোর পিছনে এসে দাঁড়ায়। তখনই হাসি বলে, 'কি, রুমালে খাড়বি?'

পূর্ণিমা 'না' বলে বাম হাত ভাঁজ করে হাসিকে ছোট্ট চাপড় দেয়। মুখটা একটু তুলে হাসির দিকে চায়, 'চুপ কর' বলে মুচকি হাসে, সলজ্জ। এই হাসি সলজ্জ ঠিকই কিন্তু একই সঙ্গে তাতে ভয় ও শঙ্কা। ভয় এই জন্যে- এখন হাসির এইসব কথায় যদি সে মেসোর কাছে ধরা পড়ে যায়; আর শঙ্কা- যেখানে সে এইমাত্র মেসোর সুবাস লেখা খাতাটা রেখে এসেছে তা যদি নীলিমা কি নন্দ দেখে ফেলে? পূর্ণিমা জানে, নন্দ যদি কোনও কারণে ঘুড়ির কাগজ খুঁজতে ওইখানে হাত দিয়ে ওই পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে নিয়ে যায়, তা হলে? অথবা, দিদিমা যদি কোনো কারণে হিসাব লেখার জন্য ওইখাতা বের করে দেখে, একটা বড়সড় গোলাপের তলে লেখা, সুবাস!

এই ভয় আর শঙ্কা মিলিয়ে পূর্ণিমা প্রফুল্ল মেসোর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। পাশে হাসি। হাসির জন্যও মেসো এক তা কাগজের এপাশে-ওপাশে দুটো ফুল এঁকেছে। মাঝখানে দুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে যার মধ্য দিয়ে আর একটা গোলাপ লতিয়ে উঠেছে। পেন্সিলের দাগে দ্রুত লতিয়ে-ওঠা মদ্যিখানের গোলাপটাকে হাসি আর পূর্ণিমা বিস্ময়ে চেয়ে দেখে। দেখতে দেখতে হাতটার ভিতরে ডালপালা আর কাঁটা নিয়ে গোলাপটা দাঁড়িয়ে যায়। এরপর প্রফুল্ল হাতের নিচের দিকে পেন্সিল টেনে নিজের কোলের দিকে নিয়ে আসে। হাতের কব্জিতে এক জোড়া করে চুড়ি পরিয়ে একটু ঘাড় হেলিয়ে পিছনে চায়। ঘাড় হোলানোয় হাসির চোখ তার চোখ পড়ে না। কিন্তু আঁকা যে শেষ আর এখনই প্রফুল্ল জানতে চাবে তলে লেখার কথা। তা তো হাসির জানা ছিল। প্রফুল্ল যেন সেই মতোই বলে, 'কী লেকপো?'

হাসির কিচ্ছু লেখানোর ইচ্ছা ছিল না। মেসো না বললে তার মাথায় কিছু লেখার কথা আসতে কি-না তাও সে ভেবে পায় না। সে ভেবেও রাখেনি এই ফুলের তলে কিছু লিখতে হয়। তার চেয়ে কিছু না লেখা এই অবস্থাতেই বরং একখানা টেট্রন কাপড়ের ওপর লিখে বাঁধিয়ে রাখলো ভালো দেখাবে। সে যদি দাদুভাইকে বলে তার জন্যে একখন্ড কাপড় নিয়ে আসতে, তাহলে এই লেখা অনুযায়ী সে রুমালে আঁকতে পারতো। এই ভাবনায় মেসো এভাবে ঢুকে পড়লে হাসি থতমত খায়। তার কিছুই লেখানোর ইচ্ছে নেই। বরং এইভাবেই গোলাপে লাল, ডাঁটে সবুজ, হাতে কালো আর চুড়িতে নীল সুতো দিয়ে এঁকে দিলেই হলো, তার নিচে আবার লেখা কেন?

এই ভিতরে ব্যাগরা বাধায় পূর্ণিমা, 'এ হাসিদি, কও না কেন জামাই কী লেখপে?'

- 'হাসি?' প্রফুল্ল বলে, 'কী লেকপো?

ফলে হাসিকে একটুক্ষণ সময় নিয়ে বলতেই হতো, প্রফুল্ল কী লিখবে। সে কথা হাসির মুখেই থাকে। তার আগে প্রফুল্ল বলে, 'লিখি, স্বাগতম।' পর মুহূর্তেই হাসি আর পূর্ণিমার কাছে জানতে চায়, 'স্বাগতম বানান কী?'

এ বড় ধন্ধের কথা। পড়াশোনার হাসি 'খক্কারহাড়ি' আর পূর্ণিমা মোটামুটি। কিন্তু সেই মোটামুটির মাত্রা এমন নয় যে, স্বাগতম বানান পারবে। হাসি বলে, 'সা, গ-য় ও-কারে গো, ত আর ম।'

প্রফুল্ল জানতে চায়, 'কোন স-?'

হাসি বলে, 'তালুবই শ।'

পূর্ণিমার হাসি এখন ঠোঁট থেকে দাঁতে গেছে। এতক্ষণে সে যেন বানানটাই প্রায় করে ফেলেছে- এই ভঙ্গিতে বলে, 'আমি কব?'

প্রফুল্ল বলে, 'কও।'

- দন্তে স আকারে সা, গ, ত আর ম।'

হাসি আর পূর্ণিমা হাসে।

প্রফুল্ল বলে, 'এই হল নাইন-টেনে পড়ার ছিরি? স্যাররা কিচু কয় না!'

এতক্ষণে প্রফুল্ল 'স'টাকে লম্বায় একটু ছোট রেখে সেই তুলনায় লম্বা করে আকার দিয়ে 'গ', 'ত' আর 'ম' লিখে 'স্বাগতম' লেখা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। আর হাসি পূর্ণিমাকে পড়াশোনার বকাঝকা বা গালমন্দ করার ফাঁকটুকুতে, এই শেষটানে যখন সে 'স' এর নিচে 'ব' ফলাটা দিতে দিতে বলে 'ইস্কুলের গেটে-টেটে লেহে না। তার?' বলতে বলতে প্রফুল্ল 'স্বাগতম' লেখা শেষ করে খাতাটা হাসির হাতে দিয়ে মাঘ-সকালের রোদ্দুরে তার পিঠটা একটু চুলবুল করে উঠলে প্রফুল্ল উঠে যায়। তারপর বলে, 'পড়াশুনা এট্টু ভালো কইরে কর শাশুড়িরা- কাজে লাগবে।'

...

পিছনের ঘেরা বারান্দায় চালের আড়ার সঙ্গে নন্দর বইপত্তর থেকে হাতখানেক ফাঁক রেখে পূর্ণিমা নিজের বইপত্র রাখে। মাঝখানের জায়গাটুকু একটা লাটাই ও গোটা ছয়েক লাটিমকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে এই জায়গাটুকু ফাঁক রাখা। এখানে যেগুলো প্রতিদিন ইস্কুলে নিয়ে যেতে হয়, সেগুলো রাখে। বইয়ের চেয়ে খাতা বেশি। বাকি বইপত্র থাকে ঘরে, মায়ের শিথানের কাছে। পূর্ণিমা খাতাটা রেখেছে নন্দর বইখাতা-লাটাই লাটিমের পাশ থেকে সরিয়ে, এমন কি নিজেরও বইখাতার বাইরের দিকে। যেন, লাটাই-লাটিম নিতে এসে কোনোভাবে খাতাটা টেনে বের না করে। নন্দ মাঝেমধ্যেই পূর্ণিমার একটা-না-একটা খাতা টেনে বের করে তার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ঘুড়ির লেজ বানায়। এমন তো কতোদিন গেছে, পূর্ণিমা ইস্কুলে অঙ্ক খাতা খুলে দেখে ভিতরে পরপর কয়েকটি পাতা নাই। তারপর বাড়ি এসে মাঠে যেয়ে দেখে নন্দর ঘুড়ির সেই দিন সবচেয়ে বড় লেজ। এতো বড় লেজ যেন ঘুড়ি মাঝ আকাশে সব গাছের মাথা ছাড়িয়েও উড়তে লাগলে মনে হয় সেই ঘুড়ির লেজ মাটি ছুঁয়ে যাবে। ঘুড়ির এমন লেজ দেখে তো হাসির দাদু একদিন নন্দকে বলেছিল, খাট্টো মাইনষে ঘুড়ির খালি ল্যাজে বাহার! চোরার এতে যোগগোতা নাই ওতে আচে। খাতাটা রাখার সময় খাতার পাতা ছিঁড়ে নন্দর ঘুড়ির লেজ বানানোর কথাও পূর্ণিমা ভেবেছে। খাতা রাখার পর থেকে এই আতঙ্কে পূর্ণিমার সময় কাটলেও এর মধ্যে দিদি নীলিমার কথাও ভেবেছে আর এক ফাঁকে ভেবেছে সে নিজেই যদি প্রফুল্ল মেসোর এঁকে দেয়া পাতা ছিঁড়ে অন্যত্র সরিয়ে রাখে? কিন্তু রাখবে কোথায়?

একটা ফুলদানির ভিতরে এক থোকা ফুল আর নিচে 'সত্যই সুন্দর' লিখে প্রফুল্ল মেসো মঞ্জু মাসিকে বলেছিল, কাগজটা ভাঁজ না করতে। যখন

টেবিলের চাদরে আঁকবে তার আগে সমান জায়গায় রেখে বড় বাঁশ সুই দিয়ে দাগগুলোর ওপর দিয়ে ফুটো করে নিলে হবে। তারপর কাগজখানা চাদরের ওপর বসিয়ে চার কোনায় খেজুরের কাঁটা গেঁথে টান-টান করে কাগজের ওপর নারকেলের তেল ঘষে দিলে কাপড়ে সুন্দর দাগ পড়ে। সেই দাগের ওপর সুতো দিয়ে সেলাই দিলেই লেখাগুলো ফুটে উঠবে। তখন মঞ্জু মাসি প্রফুল্ল মেসোকে আর একটা কাগজে 'জাতের মেয়ে কালো ভালো'- 'নদীর জল ঘোলাও ভালো' লিখে দিতে বলেছিল। প্রফুল্ল লিখে এই দুই লাইনের মাঝখানে নদীর স্রোত এঁকে দিয়েছিল। এখনো হাসিদের বাড়ির বড় বারান্দার সামনের দরজায় সেই লেখা টাঙানো আছে। মঞ্জু মাসি অবশ্য সুতোর কাজ না করে সেখানে পুঁথি বসিয়েছে। মঞ্জু মাসির হাতের কাজ যা সুন্দর! কত সুন্দর- সেই কথা পূর্ণিমা বলে বোঝাতে পারবে না। মঞ্জু মাসি সুতোয় কাজ করলে ভালো হয়, পুঁতিতে কাজ করলে ভালো হয়, মাছের আঁশটেয় কাজ করলে ভালো হয়। মঞ্জু মাসির এইসব গুণের কথা জন্মের থেকেই শুনে আসছে। কতবার কতোদিন শুনেছে তার গোনাগুনতি নাই। কিন্তু হাসিদি মাসির কোনো গুণের 'গ'-ও পায় নাই। এই যে দুপুরবেলা মেসো দুই হাতের মাঝখানে ফুল এঁকে দিল, এই হাত ও ফুল হাসি সুতোয় আঁকবে না। আর যদি আঁকে, তা দেখতে যা হবে- পাতে দেয়ার মতো না!

এই পর্যন্ত, এই পিছনের বারান্দা থেকে পূর্ণিমা বড়দাদুদের উঠানে তাকিয়ে দেখে এখন বিকালের মুখে উঠানটা ফাঁকা- শেষ বিকালের রোদ শুয়ে আছে। এমনভাবে যেন বহুকাল আগে আশপাশের গাছপালায় পাতা ছিল তারপর আর কোনো কালেও এইসব গাছপালাপাতা কোনো কিছুই আর কোনো জলের স্পর্শ পায় নাই; ফলে, এর পাতায় সারা উঠান-বাড়িঘরের ধুলা লেগে রয়েছে- সেই ধুলায় গাছগুলো মলিন! এইভাবে এক নজর চেয়ে পূর্ণিমা তো উঠান হয়ে উঠানের মদ্যিখানের কাছারি ঘরে হয়ে এর একপাশ থেকে সোজা চোখ খালের ওপারে রাস্তায় নিয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে কয়েকটা ছেলে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন দক্ষিণধারের বাড়ির নলিনী মামা। নলিনী মামার যা স্বাস্থ্য, ছায়া দেখেই চেনা যায়; তার সঙ্গে দেখো একটা ছেলে... এমন প্যান্টপরা যে দেখে মনে হয়... এই সময় পিছন থেকে হাসি এসে 'হই' করে ওঠে। পূর্ণিমার ভয়ে চমকায়। তার হাতে ধরা খাতাটা প্রায় পড়ে যেতে লাগলে সে উলটো ঘুরে হাসিকে ধমকে ওঠে, 'ছেমড়ি, একদোম ভয় পাইয়া গেছি। ওইবিলে? হই দিয়ে ওডো?'

হাসি পূর্ণিমাকে জড়িয়ে ধরে, 'এইহানে দাঁড়াইয়া দেহো কী?' বলে, পূর্ণিমার চোখের দিকে পলকখানেক তাকিয়ে নেয়, 'দেখছো?'

পূর্ণিমা হাসির রহস্য বোঝে না, 'কী?'

- 'কী?'

- 'দেহো নাই- তার এইবিলে চাইয়া ছিলি কী জইন্যে?'

- 'কী দেহো না?'

- 'এই এত্তিবেলা, রাস্তাদা তোর সুবাস গেছে।'

- 'হু। তোরে কইচে।'

- 'তোরে কইচে না। নলিনী মামার সাতে- মুই ছেলাম বড় দিদিমাগো কলের গোড়ায়- সেই সোমায় দেকচি। এট্টা নীলা প্যান্টপরা- তুই দেহোনাই?'

এবার আসলেই হাসির কথা বিশ্বাস করতে হয় পূর্ণিমাকে। সেও তো দেখেছে নলিনী মামার পাশে দিয়ে একজন মানুষের পা। এর চেয়ে বেশি কিছু এইখান থেকে দেখা যায় নাই। ফলে, পূর্ণিমাকে হাসি সত্যি সুবাসকে দেখেছে কি না তা জানার জন্যে নুয়ে পড়তে হয়, 'এ হাসিদি, তুই সত্যি দেকচো?'

হাসি গাল ফোলায়, 'না, মিথ্যা দেকচি। মুই সুবাস বাবুরে চিনি নাতো - কী কও?

- 'না চোনো। তয়, আমি এইহানে দাঁড়াইয়া দেকলাম না- সেই জনন্যে।'

- 'সে মনে কয়- নলিনী মামাগো বাড়ির উপারদা- মাঠ দিয়া শেখমাইডগা যায় নাকি?'

পূর্ণিমা এট্টুক্ষণের ভেবাচ্যাকা খেয়ে হাসির দিক চেয়ে থাকে। হাসির এই কথার অর্থও যেন তার বোধে কুলিয়ে ওঠে না। এতক্ষণ খাতাটা সে যেভাবে হাতে ধরা ছিল সেভাবে খাতাটা ধরে রেখে হাসির দিক থেকে মুখটা আবার বাইরের উঠানোর দিকে উঠান থেকে কাছারি ঘর, কাছারি ঘর থেকে খাল থেকে খালের ওপারের রাস্তায় নেয়- সেখান থেকে একটু আগে হেঁটে গেছে সুবাস। সেই পথটার দিকে সে চেয়ে থেকেও সুবাসকে দেখে নাই। নিজের ভুলে আর অমনোযোগ নিজেই নিজের কাছে খানিকক্ষণের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এরপর হাসির দিকে চায়। পূর্ণিমার এই উদ্দেশ্যহীন চাওয়া-চাইতে খানিক বিরক্ত হাসি ঘুরে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার হাত ধরে বলে, 'ল, হাডেরলামার দিকে যাই-

পূর্ণিমা হাতে-ধরা খাতাটা নিয়েই দুই পা হাঁটে। এরপর আবার ফেরে। ফিরে এসে খাতা আগের জায়গায়ই, নিজের বইখাতার নিচে রাখে।

হাডেরলামা মানে বাড়ির সীমানার পরে যেখানে মাঠ শুরু, সেখানে এসে তারা সোজা দক্ষিণধারের অন্য বাড়িগুলোর সীমানা আর বলেশ্বরের কূলের দিকে চায়। কিন্তু, কোথায় সুবাস?

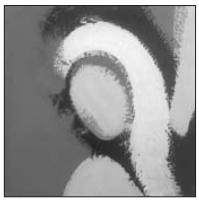

২.

সুবাস প্রথম এসেছিল কার্তিকে। আশ্বিনের শেষাশেষি বড়পূজার পর। সঞ্জয়ের সাইকেল কিনতে। তখন তো পূর্ণিমা জানতোই না, তার নাম সুবাস। বিকালে ছিবুড়ি খেলতে খেলতে সে, হাসিদি আর নন্দ দেখেছিল সঞ্জয় মামার পিছন লম্বা, গায়ে মাংস নাই, এমন নেড়েচেড়ে হাঁটে যেন যেকোনো সময় রাস্তায় শুয়ে পড়বে এমন একটা ছেলে চার পার হয়ে বাড়িতে ঢুকল। ছেলেটাকে উঠানে দাঁড় করিয়ে সঞ্জয় মামা সাইকেল বের করতে ঘরে ঢোকে। এ সময় ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল মাঝ উঠানে। কোনোদিকেই তাকাচ্ছিল না। পূর্ণিমা বুড়িচির ছুট দেয়ার আগে ছেলেটার দিকে চেয়েছিল। অমন লম্বা ছেলে যার মাথার চুল ঘামে ভেজা- দেখতে মনে হয় কেউ সারা পথ দাবড়ে নিয়ে এসেছে। তখন তো পূর্ণিমা জানতো না সুবাসের বাড়ি খালিশখালী। অতদূর থেকে দুপুরের ভাত খেয়ে একজন মানুষ রওনা দিলে এই কার্তিকের বেলায় তার হেঁটে আসতে আসতে চেহারা ওরকম হয়ই। কিন্তু পূর্ণিমার তো তা বোঝার উপায় ছিল না। সে বরং তখনই ছুঁয়ের ঘরের ভেতরে থাকা হাসির কানে কানে বলে, 'দেকছো- ওই ছেমড়ারে কেমন দাঁড়কাকের নাহান দেহায়?' হাসি তখন প্রথম চেয়ে দেখে। হাসির তা মনে হয় না। হাসির মনে হয়, ছেলেটাকে দেখতে তার ছোট কাকার মতন। খালি মাথার চুলগুলো কোঁকড়া হলেই হতো। ওদিকে, বুড়ির ঘর থেকে নীলিমা গলা উঁচু করে, 'আমারে কি তোরা বাইর হরবি না? হাসি নয় বুণ্ডি এট্টা ছু দে-
'

শৈব্যা ছুঁ দিয়ে ফিরে এসেছে। নীলিমার বেশ কর্কশ চিৎকারে সুবাস ফিরে তাকায়। তাতে অবশ্য পূর্ণিমার ধারণার একটু বদল ঘটে- না, ঠিক দাঁড়কাকের মতন না, ফরসা গলাডা রাজহাঁসের মতন লম্বা। এ সময় সঞ্জয় মামা সাইকেল নিয়ে বের হলে পূর্ণিমা দিদি নীলিমাকে বুড়ির কোর্ট থেকে বের করে আনার একটা সুযোগ পায়। এক ছুঁ দিয়ে সে যখন দু'জনকে ধাবড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে, সেই দু'জন ওই সাইকেলের ওই পাশে চলে গেলে কোনাকুনি আটকা পড়ে- সে সুযোগে পূর্ণিমা উলটো দিকে ধাবড়ে দুইজনকে তাড়িয়ে দিয়ে নীলিমাকে ডাকে সে যেন দৌড়ে যায়। নীলিমা তাই যায়ও। তাতে এই দানে বুড়িকে ফিরিয়ে আনতে পেরে খেলায় এক প্রকার জিতই হলো। কিন্তু সঞ্জয় মামা সাইকেল নামাতে যে সুযোগটা হয়েছে, সেই সুযোগের কথা যখন আহ্লাদি, শুক্লা বা স্বপ্না- কেউই তুলল না, তাতে পূর্ণিমা অন্তত সুবাসের ওপর একটু কৃতজ্ঞ হয়। এমনকি হাসির সঙ্গে তা নিয়ে কথাও বলে। হাসি হাসতে হাসতে তার গায়ে গড়িয়ে পড়ে বলে, 'তোর ওই দাঁড়কাক ছেলে বুইলগা এই ছুঁতে নীলিরে ঘরে আনতে পারছ।'

- 'মোর দাঁড়কাক?'

- 'না, তুই কইচো দাঁড়কাকের মতন।'

- 'না, তহন সঞ্জয় মামা সাইকেল নামাইচেল বুইলগা সুবিধা হইচে-

এর ভেতরে নীলিমা ঢোকে। যদিও হাসির আর পূর্ণিমার কথার অর্ধেকের অর্থই সে পহেলা বুঝতে পারে না। তারপর যখন বোঝে ততক্ষণে সুবাস উঠানের মাঝ বরাবর দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সঞ্জয় সাইকেলটাকে বারান্দায় তুলে রাখছে আর সুবাস আবার ফিরে আসছে;

এরপর সে আবার সঞ্জয়কে কী বলে দাঁড়িয়ে থাকে।

এর ভেতরে নীলিমার যা স্বভাব, সে বলে, 'ওই ব্যাডা এইহানে হরে কী?'

হাসি বলে, 'আস্তে ক, শোনবে-

এ সময় সুবাস একবার এই দিকে চেয়ে দেখে, তারপর আবার মাথা নিচু করে উঠোনের উল্টো দিক দিয়ে হেঁটে চলে যায়, একটু যেয়ে ফিরে সঞ্জয়কে আবার কী যেন বলে। তারপর আবার আগের মতো মাথা নিচু করে একইভাবে হেঁটে যায়। তাতে অবশ্য প্রথমে বোঝা যায় না, কোনদিকে যাচ্ছে। বাড়ির বাইরের মানুষের তো ভিতরের বাড়ির দিকে এইভাবে হেঁটে যাওয়ার কথা না। ভিতরের বাড়িতে কী? হয়তো কালিদাস মামার কাছে যেতে পারে। তাই, আর এক দান খেলা শুরু আগে, হাসি বলে, 'আমাগো ঘরের দিক যায়।'

সেদিকে নাও যেতে পারে। কিন্তু ওই দিক দিয়ে নেমে সে যেমন মাঠ ধরে যাবে, সে উপায়ও নাই। মাঠে ধান। পূর্ণিমা সেই দিকে গোলঘরের একেবারে পেছন পর্যন্ত যায়। এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে আসতে দেখে, ছেলেটা আবার ফিরে আসছে। এসে, সঞ্জয় মামার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মাঠের পাশ দিয়ে পূর্বের বাড়ি যাওয়া যাবে কি না, তাই জানত চায়। সঞ্জয় মামা বলে, 'না, ওই বড় পুকুরের পাশ দিয়ে বাগানের ভিতর দিয়া যাবে। তুমি যাবা কোতায়?'

- ওপার।'

- 'শেখমাটিয়া?'

- 'হয়।'

- 'সেয়া পাওয়া যাবে না- রাস্তা দিয়া যাইতে হবে।'

'ও' বলে সে এবার মন্ডপের কোল ঘেঁষে, পূর্ণিমাদের কোর্টের কাছ থেকে ধীর পায়ে হেঁটে চলে যায়। এ সময় হাসি ছুঁ দিয়ে ফিরেছে, সে এসে বলে, 'পুন্নি তোর দাঁড়কাক যায়।'

তার আগে, ওই বিকালেই পূর্ণিমা-নীলিমা আর হাসি জেনেছিল, সঞ্জয় মামার কাছে সুবাস এসেছিল সাইকেল কিনতে। সুবাস চলে যাওয়ার পরপরই সঞ্জয় মামা যখন মন্ডপের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, সে সময়ে হাসি একগাল হেসে দিয়ে বলে, 'ও মামা, ওই ছেমড়ার বাড়ি কোতায়?'

-'খালিশাখালী-'

- 'তার, শেকমাইডগা যায় কী জইন্যেই'

'- ওর বড়দির বিয়া দেছে, সেই বাড়ি যাবে মনে হয়।'

এর ভেতরে পূর্ণিমা বলে, 'আইচেল কী জইন্যে?'

- 'সাইকেল কেনতে-

- 'ও মা,' হাসি বলে, 'আপনে সাইকেল বেইচকা দেবেন?'

- 'হয়।'

- 'সেইর পর চালাবেন কী?'

- 'চালাব না।'

- 'হু মিত্যা কতা-' পূর্ণিমা বলে, 'মামায় মনে কয় মটরসাইকেল কেনবে।'

- 'তোরে কইল কেডা?'

- 'তয়, আপনাদের বাগেরহাট যাওয়া লাগবে না?'

সঞ্জয় উত্তর দেয়ার আগেই হাসি আবারও এক গাল হেসে দিয়ে বলে, 'মামার শ্বশুর বাড়িদা দে নিকি?

এই সময়ে শৈব্যা ছুঁ দিয়ে ফিরেছে। ফলে, সঞ্জয়ের সঙ্গে তার কথা এগোনোর আগেই পূর্ণিমা ছুঁ দিতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলে হাসি বলে, 'ও মামা, ওই ছেমড়ার দিদিগো শেখমাইটগা কোন বাড়ি?'

- 'সেয়া জানি না। মনে কয়, তোগো বাড়ির দিক।'

- 'নাম কী?'

- 'সুবাস।'

এই সময়ে পূর্ণিমা কোর্টে এসে ঢোকামাত্র সুবাস শোনে কিন্তু কেন 'সুবাস' বলে সঞ্জয় মামা চলে গেল তার কিছুই বোঝে না। ওদিকে এইমাত্র শেষ হওয়া ছোট্ট ছুঁয়ের পরে একজনকে মেরে এসে এবার যখন হাসিকে সে বলবে ছুঁ দিতে যাওয়ার জন্যে, তার আগে 'সুবাস' শুনে ওই বোঝা না-বোঝা থেকে সে বলে, 'হাসিদি কীসের সুবাস?

- 'কিছুর না। শৈব্যা যা- আহাদিরে মাইরগা আয়-

- 'না। ওই যে মামা কইল-

- 'ওই ছেমড়ার নাম সুবাস- ওয়ার দিদির বিয়া হইছে বলে আমাগো বাড়ির দিক।'

- কোন ছেমড়া?' এটা অবশ্য পূর্ণিমা ইচ্ছা করেই জিজ্ঞাসা করেছে। আর হাসি তা বুঝতে পেরে বলে, 'ওই যে, ছেমড়া এত্তিবেলা গেল- ওইয়ার নাম সুবাস, তোর দাঁড়কাক।'

- 'মোর দাঁড়কাক? কেন, আমি সেরে পুষি নিকি?'

- 'সেয়া জানে তুই।'

- 'তোরে কইচে-

এই রাতে পূর্ণিমা সুবাসকে ভাবে। প্রথমে জাগরণে, এরপর স্বপ্নেও। অথচ সকালে উঠে পূর্ণিমা ভেবে পায়নি সে কেন সুবাসকে ভেবেছে? জাগরণে যখন তার মাথায় সুবাস তখন তো সে মনে করেছে হাসিদি তাকে বারকয়েক ওই তোর দাঁড়কাক, তোর দাঁড়কাক যায় বলেছে- এই জন্যে হয়তো তার মাথায় সুবাসের নাম খেলেছিল। এছাড়া অন্য আর এমন কী কারণ সুবাসের নাম তার মাথা আসতে পারে? সে তো ভালো করে সুবাসের মুখও দেখে নাই। অথচ, স্বপ্নে স্পষ্টই মুখ দেখল। সেই মুখে কোথাও ঘাম নাই, চুলে ঘাম নাই; ঘাম চুল ও কপাল বেয়ে পড়ছেও না। কিন্তু কেন যে সুবাসকে পূর্ণিমা স্বপ্নে দেখেছে তা বাকিটা রাত্তির নিজে নিজে মিলিয়ে নিতে নিতেও যখন পূর্ণিমার রাত্তির শেষ হয়ে গেলে, ভোর হলো, সে হাঁসের খোঁয়ার ছেড়ে দিল, হাঁসের পাল হেলেদুলে চারধারে কলকল রবে জানিয়ে নড়েচড়ে যেয়ে খালে নেমে পড়ল তখন হাঁসের পালের ওই নামার সঙ্গে সেও সুবাসকেই ভেবেছিল। অথচ তার না ভাবলেও চলত। তারপর চেয়ে দেখে, দিদি উঠছে, ভাই উঠেছে। নন্দ উঠেই দক্ষিণের পগারের দিকে গেছে ছইলার মূলে বাঁধা ভাসিয়ে দেয়া বড়শি টোকাতে। নীলিমা ঘরের সামনের কোনায় একটুক্ষণ বসে থেকে তারপর সামনের ছোট পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটলার ওপর যেয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকলো। আর তাওয়ার নিভে যাওয়া আগুন থেকে ছাই নিয়ে পূর্ণিমা মুখ ধুতে বড় পুকুরের দিকে যায়। যেয়ে দেখে হাসিদিও ঘাটলায় বসে আছে।

নিজের সঙ্গে নিজের ঘোরের সঙ্গে পূর্ণিমা যতই সুবাসের সুবাস জড়িয়ে নিয়ে চলুক, এখন, এই মুহূর্তে, হঠাৎই সে হাসির কাছে সে কথা কীভাবে পাড়ে? যদি হাসিদি কিছু মনে করে? তাছাড়া, তাকে তো সুবাসের নাম ধরে হাসিদিই খেপিয়েছে, এখন সেই হাসিদিকেই বা কীভাবে বলা যায় কাল রাত্রে সে সুবাসকে ভেবেছে আর পরে সুবাসকে স্বপ্ন দেখেছে? ফলে, দাঁত মাজতে মাজতে যতক্ষণে সূর্য সকালের রোদ নিয়ে পুকুরের ওই পাশে ধানগাছের মাথার ওপরের সমস্ত শিশিরের গুঁড়ি, নারকেল গাছ, কলাঝোপ ইত্যাদির ভেতর দিয়ে জেগে ওঠা দেখে হাসি আর পূর্ণিমা তখনও কথা কইছে, তখন তো হাসিকে মনে করিয়ে দিতেই হয় যে, পূর্ণিমার আইজকে ইস্কুল নাই?

সে কথা অবশ্য হাসি না ভাবলেও পারতো। এতক্ষণ তার দুইজনে যাই বলুক- এবার ধান ভালো হবে কি হাসিদের বাড়ি এখন আর মাঠের পথে যাওয়া যাবে না কি সরকারি পুকুরের পাড়ে এবারের নীলের মেলায় জমে না-জমে অথবা সুপার্থ কবে হাসিকে নিতে আসবে যেন পূর্ণিমা বলতে পারবে কেননা, পূর্ণিমা ইস্কুলে যায় আর সুপার্থও, তাতে সুপার্থ যেদিন ছুটি পাবে সেইদিন সেইদিন আসতে পারবে, ভাইটাকে কতোদিন দেখে না হাসি, না জানি মাথায় কত বড় হয়ে গেছে? এর ভিতরে যখন পূর্ণিমা তোলে এবার হাসি কোন ক্লাসে পড়তো? তাও হাসি হিসাব করে বের করতে পারে; তার এবার আইএ পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল আর সুপার্থই তো এবার পড়ে নাইনে, পূর্ণিমাও নাইনে পড়ে যদিও তার এবার মেট্রিক দেয়ার কথা ছিল- এই সমস্ত আলাপের ফাঁকে পূর্ণিমার দিদিমা চিৎকার দিয়ে ডাকার আগে হঠাৎই যখন হাসি বলে যে আজকে তার ইস্কুলে যাওয়া লাগবে কি না তখনই যেন তারা দু'জন আলাপ থেকে সরে আসে। যাক, এতোক্ষণ তা হলে- সুবাসকে না ভেবে সুবাসের কথা না- বলে পারা গেল।

কিন্তু তাও কি পূর্ণিমা মনে মনে চাইছিল? আসলেই, পূর্ণিমা কি মনে মনে চাইছিল সুবাসকে ভুলে থাকতে? হয়তো চাইছিল, হয়তো চাইছিল না। সে আসলে জানে না, আদৌ জানে না সে সুবাসকে ভেবেছে কি ভাবেনি। ভাবলেও কেন ভেবেছিল তাও জানে না। আর, এই যে এতোক্ষণ হাসিদি একবারও তাকে গতকালের দাঁড়কাকের কথা মনে করিয়ে দিল না, দিলে কী আর এমন মন্দ হতো?

তার মানে, পূর্ণিমা মনে মনে সুবাসকেই ভাবতে চাইছে। কিন্তু তাও

ভালোমতো পারা গেল না। এমনিতে ওই বুড়ির জইন্যে কোনো কাজ সুস্থমতো করার উপায় থাকলে তো? দিদিমা আসলে বেশি কতা কয়। সারাডা দিন দিদির পিছনে লাগা আছে। মায়রে তো প্রায় দেখতেই পারে না। আর ভাইডিরও সেই অবস্থা। এ সময় দক্ষিণ দিকে খালের প্রায় কাছ থেকে নন্দকে খালের পাশের পগারগুলোয় নুয়ে আবার উঠে এসে ছইলা গাছের মূলেবাঁধা বড়শি টোকতে দেখে সে চলে আসতে আসতে বারখানেকের জন্যেই তো সুবাসকে ভাবা ভুলে গেছিল। আর সেই সময়ে, ওই যখন এরপর আবার সে সুবাসকে মনে করবে বলে ভেবেছে, সেই সময়েই দেখে দিদিমার চিৎকার! ওই গলার স্বরের সঙ্গে যদি পারা গেছে। দিন দিন তা বাড়তেছই তা বুড়িকে বোঝায় কে? মানুষ বুড়া হইলে সুস্থ হয়, তা না, এই বুড়ির দোম দিনে দিনে বাড়ে। বাড়তে বাড়তে কোন জায়গায় যেয়ে ঠেকপে তা খালি ভগোবানই জানে। ভগোবান এতো মানুষের এতো তা করে, বুড়িরে চোখে দেহে না... বুড়ির গলার স্বরডা এট্টু কোমাইয়া দেলে পারে। তা করবে নানে।

- 'ও পুন্নি, এই বেইন্নার স্বর বেয়ানে ঘাডলায় যাইয়া ফুলা চাডাম মারতেচো- এট্টু এদিকে আসা লাগে না। পান্তার জল ঝরাইয়া গামালায় ঢালা-

পূর্ণিমা এই পর্যন্ত শুনে ভেবেছে, তাকে পান্তার জল ঝেড়ে গামলায় ঢালার কথা বলছে দিদিমা, কিন্তু এর সঙ্গে, 'আইসকা দেক, সারা ওস্যাঘর (রান্নাঘর) ভাসাইয়া এহেবারে কী অবস্থা কইরগা থুইচে তোর বুইনে-', এতে সে বোঝে, দিদি জল ঝেড়ে গামলায় পান্তা ঢালার সময় ফেলেছে। পূর্ণিমা যথাসম্ভব দ্রুত দৌড়ে আসে।

ফলে, তার আর সুবাসকে ভাব হল কই?

সুবাসকে সে ভাববেই-বা কেন? এই সকালে, এখন, সুবাসকে ভাবার সময়? তার আগে দেখো দিদিমার ঝাঁজের মুখে পড়তে হল, দাঁত মাজতে লাগে কতখুন?'

- ' কেন হইচে কী?'

দিদিমা রান্নাঘর ছেড়ে ঘরের সামনের বারন্দার কোলঘেঁষে বাতাবিতলায় এসে দাঁড়িয়েছে যেন তার সমস্ত ঝগড়া পূর্ণিমার সঙ্গে। ফলে পূর্ণিমার ওইটুকু উত্তরে দিদিমার গলা নামে না, 'হবে কোনতা? রান্নাঘরে যাইয়া দেহো-'

পূর্ণিমা আড়ষ্ট হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে তা ছাড়িয়েও যায়। এমন তো নীলিমা মাঝেমধ্যেই করে,

' সেই জন্যেই ওই বিলে চিরহাবা-

- 'হয়, আমি তো একছেড় চিরহাই! আর তোমরা বইসকা পরান খুইলগা গপ্পো মারো।'

- 'গপ্পো মারলাম কহোন?'

- 'গপ্পো মারো নাই? আমি ওপারদা আইচি পর হইতেই তো দেকতেচি তুই আর হাসি ঘাটলায় বইসকা গপ্পো মারতেচো-

পূর্ণিমার গায়ে ওড়না ছিল না, মুখের জল মোছা হয়নি। বারান্দার দড়িতে ঝোলানো গামছা নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে রান্নাঘরে এসে দেখে, রান্নাঘরের মেঝে জলে ভেজা কলসি রাখা পাশের কোনায় এক দলা ভাত পড়ে আছে। এর পাশে থেকে জল যেভাবে নেমে গেছে তার সঙ্গে ধীরে ধীরে রয়ে গেছে ভাতের টুকরা। চুলার পাশের কোনায় নীলিমা খাইঞ্জা থালায় ভাত নিয়ে উনানে মরিচ পুড়তে দিয়ে বসে আছে। পূর্ণিমার মেজাজ চড়ে। কিন্তু এমন সকালে সে চাইলেই মেজাজের চরম দেখাতে পারে না। দিদি এই সকালে তার মেজাজ এমন জায়গায় নিয়ে গেল। কী দরকার ছিল, তাতে ডাকলেই তো পারত। ফলে, মেজাজ না দেখিয়ে শুধু গলায় সামান্য ঝাঁজ রেখে পূর্ণিমা বলে, দিদি তোর ঢক কেমন কদিন, আমারে ডাকলে পারতি-

নীলিমা কাতর চোখে পূর্ণিমার দিকে চায়। বোবা চোখ, বলার মতো কিছুই নাই তার। তাতে পূর্ণিমার সত্যিই চড়ে যায়, 'ওইরোম বলদের মতো তাহাইয়া দেহো কী- তুই আমারে ডাকলি কি জইন্যে?'

নীলিমা গলা নামিয়ে বলে, 'তোরে দেকলাম পুহুরের ঘাডলায় বইসকা হাসির সাতে কতা কইতেচো-

আবার ওই কথা মনে করিয়ে দেয়া। সে সময় ডাকলেই তো সে চলে আসত। এমন তো না, এমন কোনো কাজে বসেছিল যে ডাকলে আসতে পারত না। আর ওই কথা মনে করিয়ে কীই বা লাভ হল, ঘুম থেকে উঠে নয় সে সুবাসকে ভেবেছে, ঘুমের আগে ভেবেছে, ঘুমের ভেতরে সুবাসকে স্বপ্নও দেখেছে কিন্তু তারপর যতক্ষণ ঘাটে হাসির সঙ্গে বসেছিল ততক্ষণ একবারও তো তার সুবাসকে মনে পড়ে নাই। ফলে, নীলিমা যদি তাকে ডেকে ওই বড় হাঁড়িটার পান্তা গামলায় ঢেলে দিতে বলত অথবা পূর্ণিমার থালেই- তাহলে তো এই অনিষ্ট ঘটত না। ভাত পড়ত না, রান্নাঘর অমন জলে ভিজত না, দিদিমা এই সকালে গলায় অমন স্বর রেখে কথা বলত না; সারাটা সকাল পূর্ণিমার মন এমন কাঁটাবেঁধা কাঁটাবেঁধা ভাব থাকত না। কিন্তু এ আর নতুন কী? এমন তো মাসের ভিতরে প্রায় কুড়ি দিনই যায়। আজও নয় সেই একইভাবে গেল। ফলে, দিনের কি হল আর না-হল তা নিয়ে ভেবে এখন আর কোনোভাবেই মন খারাপ করতে চায় না পূর্ণিমা। তার চেয়ে যে জন্যে খারাপ হয়েছে সেই খারাপের ভেতরে যদি নীলিমা থাকে তার কাছ থেকেই বরং কারণটা সে ঝাঁকিয়ে বের করে নিতে চায়। তাতে যদি মনে বেঁধা কাঁটাটা একটু খসে পড়ে, সেই জন্যেই তুই আমারে ডাকলি না আর দিদিমা এই বিলে আমারে ধামকাইল?'

নীলিমা কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে।

পূর্ণিমা ফের বলে, 'এ দি, এই সহালবেলা কতা ক' ওইভাবে চুপ কইরগা থাহিস না। কতা ক' আমারে ডাকলি না কী জইন্যে? দুই-তিন দিন বাদে বাদে তুই ওইরম করবি, আর দিদিমা আর নয় মা আমারে ওইভাবে গাইলাবে?-

নীলিমা এবার চুপ করে থাকে। তবে, উনানের ভেতরে শলায় গেঁথে দেয়া মরিচে এতক্ষণে আগুনে আঁচ লেগে ধোঁয়া উঠলে নীলিমা কাশে। পূর্ণিমাও তাতে যেন তাদের কথারও খানিক ছেদ পড়ে। আর সেই ফাঁকে পূর্ণিমা ঝাঁটা হাতে নিয়ে যেদিকে ভাত পড়েনি, শুধু ভিজেছে- সেখানে ঝাঁট দিতে দিতে ফের বলে যেতে থাকে, 'বোজো তো সবই- তুই এইরম করলে আমারই সব করা লাগে। কয়দিন বাদে আমার পরীক্ষা ভাবচেলাম কয়ডা অঙ্ক করব। দিলি তো সহালডারে এহেবারে-

নীলিমা কোনওমতে বলে, 'আমার খিদা লাগজেলো।'

পূর্ণিমা চোখ বড় করে সেই চোখে একদলা করুণা মেখে দিদির দিকে চায়। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে পূর্ণিমার পহেলা দিদিমার চোখকেই মনে পড়ে। তারপর হঠাৎ কেন যেন মনে পড়ে, সুবাসের চোখ। সেই চোখ অবশ্য ভালো করে দেখেনি পূর্ণিমা। কিন্তু যেটুকু দেখেছিল, সঞ্জয় মামার ঘরের সামনে থেকে ফিরে যাওয়ার সময়, কাল বিকালে!

এই দিন দুপুরের আগে সুবাস আসে। সঞ্জয়ের সাইকেল কিনতে। পূর্ণিমা তখন ইস্কুলে। ফলে, পূর্ণিমার সুবাসকে দেখা হয়নি।

সুবাস পকেটে যে-টাকা নিয়ে কাল সঞ্জয়ের সাইকেল দেখতে এসেছিল সঞ্জয় যে সেই টাকায় সুবাসকে সাইকেল দেবে না তা কমবেশি সুবাসও জানত। তারপরও ভেবেছিল, এখন এই টাকা দিয়ে পরে বাকিটা দেবে। কিন্তু সঞ্জয় সুবাসের মতো ছেলেকে এক হাটে কিনে বাকি হাটে বেচে আসতে পারে। আন্ধারমানিক কুচয়া, বাগেরহাট খুলনা, যশোর, বেনাপোল, বনগাঁ বারাসাত, রানাঘাট শিয়ালদা, বালিগঞ্জ, হালতু কম জায়গায় সে মানুষ চড়ায়নি। নিজেও জীবনে কম বেশি ধরা খেয়েছে। সেই ধরা খাওয়ার মাত্রা যা তাতে বাপ তাকে কয়েকবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। কিন্তু এইটুকু ছেলে সুবাস এমন ন আনা ছ আনার একখানা সাইকেল নিয়ে তাকে এক হাত দেখাবে তা অবশ্য সঞ্জয় ভাবেওনি। সঞ্জয়ের এক কথা, বাবা সাইকেল নেও আর সাইকেলের একটা স্পোক নেও, নগদে নেবা। ওই যে তারপর তোমার পিছনে আমি আর আমার সামনে তুমি লুকোচুরি লুকোচুরি খেলা- এক পলকে একটু দেখা, আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কী ওর ভেতরে আমি নাই। ফলে, গতকাল সাইকেল দেখতে, সঙ্গে কিছু টাকা নিয়ে এসেও সাইকেল না-নিয়ে সোজা দিদির বাড়ি চলে গেছে সুবাস। বাড়িতে যায়নি। দিদির কাছ থেকে বাকি টাকা নিয়ে আজ এসেছে সাইকেল নিয়ে যেতে।

সুবাস সাইকেল নিতে এলে হাসি লাগে। কালকের মতো আজও সঞ্জয় সাইকেল নামিয়ে সুবাসকে দেখায়।

উঠানে শুয়ে থাকা কার্তিকের রোদে পিঠ পোড়ে। এর ভেতরে কালো রঙের চিকন প্যান্ট আর গায়ে সাদা ফুল শার্ট পরে সুবাস উঠানে দাঁড়িয়ে সাইকেল নিয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ করে। হাসি তখন সঞ্জয়ের কাছেই বড়ঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো । সঙ্গে হাসির নিজের মামা কালীদাস আর কালীদাসের বউ। সঞ্জয়ের হাতে টাকা দিয়ে সুবাস উঠানেই একবার সাইকেলটা চালায়। ফিরে এসে, তার লম্বা পা মাটিতে ছুঁয়ে 'যাই বলে' খাল পাড়ে যেয়ে সাইকেল ঘাড়ে নিয়ে চার পার হয়ে চলে যায়।

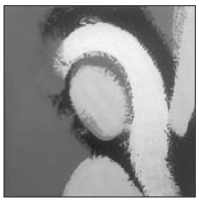

৩.

এরপরও সুবাস এসেছে, পূর্ণিমা দেখেছে কিন্তু এই দিন আসা আর তার সঙ্গে দেখা না-হওয়ার কথা তার মনে থাকবে বহুদিন। এমনকি পরে সে কথা যখন সে সুবাসকেও বলেছেও।

বিকালে শৈব্যা আহ্লাদী আসেনি বলে হাসি নীলিমা আর পূর্ণিমা দাঁড়িয়ে আসে, উঠানের কোনায় যেখানে ছুঁদেয়ার ঘর কাটে সেখান থেকে কাছারি ঘরের কোনায় যেখানে বুড়ির ঘর কাটে সেই পর্যন্ত সেখানে নীলিমা দাঁড়িয়ে যখন চেঁচিয়ে বলে, অতদূর থেকে তার দৌড়ে আসতে কী কষ্ট হয়- এ সময়, নীলিমার এই কষ্টের উত্তর দেয়ার আগেই হাসি বলে, এ পুন্নি, দুপারের আগে তোর দাঁড়কাক আইচেল-'

এবার হাসি দাঁড়কাক বলায় পূর্ণিমা রাগ হয় না। এতে সে অবাকই হয়। এমনকি এরপর সরাসরি জিজ্ঞসা করে, 'কী জইন্যে'?

- 'সাইকেল কেনতে'।

- 'কাইল তয় সাইকেল দেখতে আইচেল?'

- 'হয়। আইজ কিনগা নিয়া গেচে-

হাসির সঙ্গে এই কথাগুলো কেন বলছে পূর্ণিমা নিজেও হয়তো জানে না। এমনকি এ সময়ে শৈব্যা বা আহ্লাদী আসল, তারপর খেলা শুরু হতে যতক্ষণ, এইসব মিলে এখন হাসি যদি তাকে বলে, এখন এতকথা শুনতে তার খারাপ লাগছে না। তাও হয়তো পূর্ণিমার উত্তর দেয়ার কিছু থাকবে। এই যে হাসি তাকে বলছে, পূর্ণিমা শুনছে, শুনে নিয়ে হজম করছে তারপর সেই সুবাস প্রসঙ্গে কথাও বলছে- এই সবই যেন পূর্ণিমার নিজের মনে নিজের মতো করে বানানো। সেখানে সুবাসের উপস্থিতি নাই। সুবাসই নাই। সুবাস জানেও না। জানার কথাও না। হয়তো সুবাস যখন জানবে, ততদিন পূর্ণিমা এমনিতেই আর সুবাসকে নিয়ে ভাববে না। হাসিদি বাড়ি চলে যাবে। হাসি চলে গেলে এই প্রসঙ্গে আর মনেও আসবে না। তখন এ নিয়ে কোনোও কথা ওঠার প্রশ্ন উঠবে না। ফলে, এই যে সুবাসের প্রসঙ্গে এত কথা এতো যেন একদান ছিবুড়ি খেলারই মতো।

আবার গোটা বিষয়টাকে যেভাবে পূর্ণিমা দেখে- যদি উল্টো দিকে দিয়ে দেখা যায়: পূর্ণিমা জানে, পূর্ণিমা কালো। পূর্ণিমা খাটো। পূর্ণিমা জানে, পূর্ণিমার মাকে পূর্ণিমার বাপ নেয় না। পূর্ণিমা, পূর্ণিমার দিদি, পূর্ণিমার ভাই আর পূর্ণিমা মা-দিদিমার সঙ্গে মামার বাড়িতে থাকে। এই কথা যেন শুধু পূর্ণিমাই জানে আর জানে পূর্ণিমার মা। পূর্ণিমার দিদি নীলিমা জানে না; কেননা, নীলিমার সেই বোধ নাই। নন্দ জানে না, জানলেও আধাআধি, তাতে নন্দর এখন এই সমস্ত কিছু বুঝে চলার বয়স হয় নাই। আর এই সব জানা বা বোঝা দিয়ে কিছু যে হয় না তাও পূর্ণিমা জানে। জানে বলেই সে ভেবে নিতে পারে, সে যে আজ এখন এই একটু আগে থেকে এই কয়েকদিন, থেকে মাসকে মাস ধরে সুবাসকে ভাববে তাতে সুবাসের কিচ্ছু না, তারও না। এ বরং পুরোটাই হাসিদির এক পদের অত্যাচার। এরপর এক সময় হাসিদি চলে যাবে বাড়ি, যেমন যায়, প্রতি বছরই। সামনের মাসে ধান উঠবে তখন বাড়িতে থাকতে হবে। এমনিতে এখন কালীদাস মামারও জমি যা আছে বান্ধা লাগানো, ফলে হাসি থেকে যে মামা-মামি বা দিদিমার কোনোও কাজে আসবে সেই দরকারও নাই। ফলে, এইসব কথা- এই দাঁড়কাক, লগি, চুল বাইয়া ঘাম, যে কোনো সময় শুয়ে পড়বে এই সমস্ত- সবকিছুই স্মৃতিতে পরিণত হবে। পূর্ণিমা বরং চায়, তার আগেই সব কিছু ভুলে যেতে। আর, হাসিদি যতদিন আছে ততদিনে এই সবকিছু যদি হাসিদির কিছুক্ষণ পরপর মনে করিয়ে দেয়ার বিষয় হয়, তাতে আর যাই হোক, হাসিদি একটু খুশি হল আর পূর্ণিমাও খানিকক্ষণের জন্যে ভাবতে পারল। কিন্তু সেই ভাবনাও তো তার জন্যে কোনোও গন্তব্য রচনা করে না।

ফলে, তার মতো মেয়ে আজ সুবাসকে ভাববে... কাল ভাববে... কতবার সুবাসকে নিয়ে যাই মনে হোক... পরশু ভাববে সুবাস যদি তাকে নিয়ে যেত, তা হয়তো কোনো দিনই নিয়ে যাবে না; তবু এইসব ভাবনা তো তার যাবে না। পূর্ণিমা তো জানে এর কোনওটাই কোনওদিনও ঘটবে না। যা ঘটবে না, তা নিয়ে শুধু শুধু আশা করে লাভ কী? এই জীবনে আশা আর আশা করে সেই আশা কোনও লাভ না হওয়া তো কমবার ভাবেনি সে, তারা মা-দিদি আর সে। ফলে, সুবাসের ঘটনা ভাবতে ভাবতেই সে কতবার তা নামিয়েও দেয় মাথা থেকে। কিন্তু কী জানি কী হল, সুবাস পূর্ণিমা মাথায় গেঁথে গেল। ভালো রকম। কোনওভাবেই নামল না।

নামল না যে তা শুধু পূর্ণিমার কারণেই, তা নয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে।

এক, হাসি পূর্ণিমাকে সুবাসের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে যতদিন যতবার 'তোর দাঁড়কাক' বলে খেপিয়েছি, এর ভেতরে সুবাস দুই দিন সঞ্জয়ের কাছে এসেছে। সেই দুই দিনই হাসির সঙ্গে সুবাসের দেখা হয়েছে। সামনে পরীক্ষা বাড়িতে যত ঝামেলাই থাক এ সময় ইস্কুল কামাই দেয়া যাবে না। এমনিতে দিদিমা যত গলমন্দই করুক ইস্কুলের ব্যাপারে কোনো মাপ নাই। আজকাল নন্দ মাঝে মধ্যেই ইস্কুল কামাই দেয়।

সুবাসের আসা এই দুই দিন পূর্ণিমার সঙ্গে সুবাসের দেখা না-হওয়া আর হাসির সঙ্গে দেখা হওয়া এবং বারবার হাসির পূর্ণিমাকে সুবাসের কথা মনে করিয়ে দেয়া, এতে সেই প্রতিবারই পূর্ণিমার সুবাসের কথা মনে পড়েছে।

দুই, হাসি শেষ যেদিন পূর্ণিমাকে সুবাসের কথা বলে খেপিয়েছে, সেই দিন বিকালে ইস্কুল থেকে ফেরার পথে সাইকেল বয়েজ ইস্কুল থেকে বাড়ির দিকে হোক অথবা তালেশ্বর কুচায়ার দিকে ফিরতে দেখেছে সুবাসকে । তারা অনেকেই ফিরছিল, রাস্তায় জায়গাও ছিল কম। সেই টুকু জায়গা দিয়ে সুবাস ঠিক যেতে পারছিল না অথবা সুবাসকে যাওয়ার মতো জায়গা তারা দিচ্ছিল না। আর, পূর্ণিমা ও শৈব্যা তখন ইস্কুলের সামনের মাঠ থেকে ঢাল হয়ে রাস্তার উঠছে। সুবাস যখন সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, সে সময় পূর্ণিমা তার পাশে শৈব্যাকে বলে, 'সঞ্জয় মামার সাইকেলহান না? এই ছেমড়া কেনচে।'

সুবাস তা শোনে, শুনে সাইকেলের সিট থেকে মাটিতে দিয়ে থাকা পা ছুঁয়ে চেয়ে পূর্ণিমাকে দেখে। হয়তো এই পলকের দেখায় সুবাস পূর্ণিমাকে চিনেও নিতে পারে। এমনকি এরপর যখন শৈব্যা বলে, 'হয়। ওই যে-হাসিদি ওই ছেমড়ারে দাঁড়কাক কইচেল না?'

পূর্ণিমা মুখ চেপে হাসে, 'হয়, আস্তে ক শোনবে-'

অবশ্য শৈব্যা যা বলেছে তা শোনেনি সুবাস। কিন্তু পূর্ণিমা শৈব্যাকে আস্তে বলতে বলছে, তা শুনেছে। শুনে, সুবাসও হাসে। এবং একটু বাদে সে মনে করে পূর্ণিমার এই কথার একটা উত্তর সে এই সুযোগে দিতে পারে। সুবাস সেই কথাটার উত্তর দেয়ার জন্যে একবার পেছন ফিরে চায়। পূর্ণিমা ও শৈব্যা ততক্ষণে রাস্তার উঠে হেঁটে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তাদের সামনে-পেছনে এত মেয়ে, মেয়েদের দঙ্গলের ভেতরে এখন আবার পেছনের দিকে সুবাসের পক্ষে যাওয়া সম্ভবও নয়। ফলে সুবাস যখন আবার সাইকেল সামনের দিকে চালানোর সুযোগ পায়, সেই সুযোগে কিছু দূর সমানে যেয়ে আর ফিরে আসে। ততক্ষণে শৈব্যা-পূর্ণিমাসহ আরও কয়েকজনের পাতলা ভিড়ে সুবাস সাইকেল নিয়ে পূর্ণিমার খুব কাছে এসে জানতে চায়, সঞ্জয়বাবু বাড়ি আচে?'

তার মানে, সুবাস ঠিকই ধরেছে সঞ্জয়ের সাইকেল কিনতে যেয়ে সে এদের দেখেছিল। এমনকি একটু আগে এই কালো মেয়েটিই যে পাশের মেয়েটিকে বলেছে, তার ব্যাপারে কোনো কথা আস্তে বলতে তাও সে শুনেছে। ফলে, সুবাসের এই অতর্কিতে আসা আর সেই সঙ্গে এই প্রশ্নে পূর্ণিমা সহসাই ভ্যাবাচ্যাকা খায়; তারপর কোনো মতো তার গলায় স্বরের স্বাভাবিক ঝাঁজ রেখে বলে, 'মোরা জানি না?' এটা অবশ্য পূর্ণিমার এড়িয়ে-যাওয়ার উত্তর কিন্তু সে যদি জানত এই কথার জবাবে সুবাস নতুন কথা বলবে তাহলে হয়তো এই উত্তর সে দিত না। সুবাস বলে, 'কেন, তুমি ওই বাড়ির থাহো না?'

এই কথায় একটা খোঁচা আছে, পূর্ণিমা জানে। হয়তো সেই খোঁচাই সুবাসও তাকে দিল। অথবা সুবাস তো তাকে বলতে পারত, 'কেন তুমি ওই বাড়ির মাইয়া না?' তা বলল না। কিন্তু যে-খোঁচাই তাকে দিক সুবাস, তার তো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার দরকার। এই সমস্ত পূর্ণিমা মুহূর্তখানেকে ভেবে নিয়ে খোঁচার ঝাল ঝাড়ে, 'আপনে যাইয়া দেখলে পারেন।'

-'তোমার ধারে যা জিগাইচি সেইয়ার উত্তর দেও।'

- 'আমরা জানি না।

এরপর তাদের পা দ্রুত হয়। এর ভেতরে পূর্ণিমা একবার পিছনে চেয়ে দেখে, সুবাস সাইকেল থেকে এক পা নিচে নামিয়ে একইরকম দাঁড়িয়ে আছে।

...

তিন, এরপর সুবাসকে নিয়ে কোনো ভাববার অবকাশ ছিল না পূর্ণিমার। কারণ, সে তো কোনোভাবেই ভাবতে পারে নাই, সুবাস তাকে এইভাবে ইস্কুল থেকে ফেরার পথে সঞ্জয় মামার কথা জানতে চাইবে। ভাগ্য ভালো, পথে তেমন কেউ দেখে নাই। কালীদাস, দেবদাস, নলিনী মামা যে-কেউই দেখতে পারত। তা যখন দেখেনি তখন বাঁচা। ওইসব মঘিয়া, তালেশ্বর ধোপাখালী, বেমরতা আর ভাসার ছেলেদের সাহস একটু বেশি- সব মেয়াডাঙ্গার সঙ্গে থাকে তো- এইসবও ভেবেছে পূর্ণিমা। এবং ভাবনায় সুবাসের অমন আচরণ তার মনে যতই সুবাস থাকুক, হাসিদি যতবার বলুক তবু সুবাসের কথা সে আর মাথায় রাখতে চায় নাই। কিন্তু সে কথাও তার মাথায় আনতে হল, সেও তো সুবাসের সাহসের জন্যে।

ওই ইস্কুলের সামনে সুবাস তাকে সঞ্জয়ের কথা জিজ্ঞাসা করার দিন তিনেক বাদে সঞ্জয় মামা পূর্ণিমাকে বলে, 'ও পুন্নি তোরে খইলশাখালীর যে-ছেমড়া আমার সাইকেল কেনছে সে আমার কথা জিগাইচেল নিকি?'

-'হয়'।

- 'কী জিগাইচেল?'

- 'জিগাইচেল, আপনে বাড়ি আচেন নিকি?'

- 'তুই কী কইচিলি?'

- 'কিছু কইনাই-

- 'কেন?'

- 'হয়, ইস্কুল ছুডির পর জিগায়, সঞ্জয়বাবু বাড়ি আচে?'

- 'তারপর'?

- 'তারপর, পতের মাইদ্যে- আমি ভাবজি কি-না? কোনো উত্তার না-দিয়া খালি কইচি মোরা জানি না?

- 'তার।'

- 'সে কয় কেন, তুমি ওই বাড়ির মাইয়ে না? তারপর আমি আর শৈব্যা কোনোও কতা নাই কইয়ার চইলগা আইচি-

এরপর সঞ্জয় বলে, 'ঠিক আচে। তার তুই আইসকা আমারে কইলে পারতি যে, ওই ছেমড়া তোরে ইস্কুল ছুটির পর ওইবিলে জিগাইচেল আমার কথা। আইজ আমারে উল্টা বিলে শুনাইয়া দেল- তোরে বোলে আমার কতা জিগাইচেল তুই কিছু কও নাই।'

সঞ্জয়ের সঙ্গে এই সমস্ত কথা বলার সময়ে পূর্ণিমার কিন্তু মনে মনে সুবাসের ওপর রাগই হয়। সুবাসের এই যে সাহস, এই সাহস তার পছন্দ না। আর ওই যে তাকে খোঁটা দিয়েছে সুবাস, সে এই বাড়ির মেয়ে কি না তা নিয়ে। সব মিলে পূর্ণিমার রাগ বাড়ে সুবাসের ওপর।

...

চার, দিন কয়েক বাদে পূর্ণিমা আজও ইশকুল থেকে ফিরছে।

সেই দিন আবার সে সুবাসের একই প্রশ্নের মুখে পড়ে।

সু। সঞ্জয়বাবু বাড়ি আচে?

পূর্ণিমা জানে না, এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সে।

কাইল রাইতে ছেল এহোন আচে কি না কইতে পারব না।

উত্তরটা দিয়েই পূর্ণিমা বোঝে এভাবে বলা উচিত হয়নি।

সু। সেলে আচে।

পূ। থাকতে পারে।

সু। তুমি বাড়িদা বাইরানোর সময় দেইহা বাইরাও নাই?

পূ। না।

সু। ও আচ্চা।

পূ। আপনে আর আমারে পতে এইসব কতা জিগাবেন না।

সু। কী জিগব না? সঞ্জয় বাবুর কতা, না কোনো তা না?

পূর্ণিমা সমস্যায় পড়ে। এই কথার কী জবাব হতে পারে, সে ভাবতে পারে না।

পূ। কোনওতা না।

সু। সঞ্জয়বাবু মানা করচে?

পূ। না।

সু। তয় তুমি ওই বাড়ি থাহো না?

এই সবই ফালতু কথা। এর কী উত্তর হয় তাও যেন পূর্ণিমা এই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারে না।

পূ। থাহি না থাহি না- সেডা না। আপনে আমারে জিগাবেন না।

সু। ঠিক আচে। নাকি তুমি আমার সাতে কতাই কতি চাও না।

পূ। হ, তাই।

...

পাঁচ, কয়েক দিন বাদে। নাইন থেকে টেনে ওঠার পরে ক্লাশ শুরু হলেও পূর্ণিমা ইস্কুলে যায় নাই, এমন একদিন। শৈব্যা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে পূর্ণিমাকে জানায়, পথে সুবাস তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, পূর্ণিমা আজকে ইস্কুলে আসে নাই?

পূর্ণিমা শৈব্যার কাছে জানতে চায়, তার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করেছে? শৈব্যা বলে, 'না। কইচে, তোমার সাতে আর যে আসে সে কই?'

পূর্ণিমা হতাশ হয়, 'ও। তার তুই কী কইচো?'

-'কইচি', শৈব্যা জানায়, 'পুন্নিদি? সে কয়, সেয়ার নামি পুন্নি নিকি? আমি কইচি, না পূর্ণিমা- এর ভেতরে পূর্ণিমা ঢোকে, 'তার?'

-'তার সে কয়, ওই তো পূর্ণিমা আইজকে আসে নাই? আমি কইচি, না আসে নাই। তারপর ওইদিক চইলগ্যা গেছে।' শৈব্যা হাত তুলে পশ্চিমে দেখায়।

...

ছয়, শৈব্যার ওই হাতখানা পশ্চিমে থাকতেই পরের দিন সকালে পূর্ণিমা ইস্কুলে রওনা দেয়ার পরপরই যেন সেই পশ্চিম থেকে উড়ে এসে সুবাসের সাইকেল পূর্ণিমার পাশে থামে। সবে বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে ছাড়াভিটা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এর ভেতরে কোত্থেকে উড়ে এল সুবাস? দেখো কান্ড! কিন্তু তখনও তো পূর্ণিমা জানত না পাশের বাড়ির নলিনী মামার সঙ্গে সুবাসের এত খাতির। হয়তো সে নলিনী মামাদের বাড়ির চারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সাইকেল নিয়ে। পূর্ণিমাকে ইস্কুলে রওনা দিতে দেখেই সাইকেল ছুটিয়ে এই ছুটে এই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণিমা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সুবাস বলে, 'কাইলকে ইস্কুলে আসো নাই কেন?'

পূর্ণিমা কাতর ও ফ্যালফ্যালে চোখে সুবাসের দিকে চায়। এই মানুষটাকে এখন এখানে পাঠাল কে? ওই একই চোখে আরও খানিকক্ষণ পূর্ণিমা সুবাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পূর্ণিমা ভাবে, এখন যদি দিদিমা দেখে তয় আর কোনওদিন ইস্কুলে যাইতে দেবে না।

সুবাস তাকে আবার একই প্রশ্ন করে, 'ও পূর্ণিমা, কাইলকে ইস্কুলে আসো নাই কী জইন্যে?'

পূ। এমনে

সু। আমি ভাবলাম শরীল খারাপ করল নিকি?

পূ। না, আপনে এহোন যান।

সু। তোমারে দুইদিন পতে জ্বালাইচি কিছু মনে করো নাই তো?

পূ। না। আপনে যায়েন।

সু। আচ্চা যাই। আর জ্বালাব না।

সুবাস চলে গেলে পূর্ণিমা চেয়ে দেখে। অপলক। তার চোখ দিয়ে আতঙ্ক বেরিয়েছে। মনে হয়, অনেক কষ্টে সে এক বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

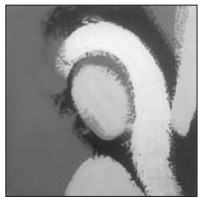

৪.

এই সমস্ত ঘটনার পরে পূর্ণিমার মনে সুবাস গেঁথে গেছে, আর নামেনি। ধীরে ধীরে সুবাসের প্রতিটি দিনে সুবাস দিন থেকে রাত্তিরের সুবাস হয়েও জাড়িয়ে গেল। এই সময়ে ভেতরে সে নাইন থেকে টেনে উঠেছে। এতদিন হাসি ছিল, হাসির সঙ্গে এইসব কথা ভাগাভাগি করতে পেরেছে কিন্তু হাসি যখন পৌষের আগে-আগে বাড়ি চলে গেল তখন বেশ কিছুদিন পূর্ণিমারও ইস্কুল ছিল না। সেই সুযোগে বাড়িতে বসে সুবাসকে ভাবারও কোনও সুযোগ

ছিল না। এমনিতে পূর্ণিমার তো এমন দিন খুব কমই গেছে যে সে একলা একলা উত্তর-পশ্চিমে চেয়ে সুবাসকে ভেবেছে। যেমন, পুবের কোনায় মাঠের দিকে চেয়ে মা সারাটা দিন কীসমস্ত ভাবে। নন্দ তো বলেই, মা বাবারে ভাবে। তা মা ভাবতে পারে। যে-মানুষ কোনওদিন দুইটা মেয়ে আর একটা ছেলেসহ বউর খোঁজ নিল না, সেই মানুষ যদি স্বামীও হয়, তার ভাবনা ভেবে মনে মনে কাহিল হওয়ার এখন আর কী আছে? মা যে কেন বাবারে ভাবে?

সেই রকমও যদি পূর্ণিমা-মায়ের মতো বসে থেকে দুই-এক দন্ড সুবাসরে ভাবতে পারত? কিন্তু সেই সুযোগ সে কই পায়?

সারাটা পৌষ গেছে দিদিমা, দিদি আর নন্দর সঙ্গে ধান টুকিয়ে। তখন মা বাড়িতেই থাকত। সেই সময়, সেই সারাটা দিন পরবাসী ও কিষানদের পিছন পিছন ধান টোকানোর সময়েও কি সে একবারও সুবাসের কথা মনে করতে পেরেছে? পারেনি। সম্ভবও ছিল না। সুবাসের কথা মনে করতে হলে তাকে ওই মাঠভরতি ধানের ভেতরেই পরবাসীদের পেছন পেছন হাঁটতে হয়, তখন কি এক বারের জন্যেও আনমনে পূর্ণিমা দাঁড়িয়ে সুবাসের কথা ভেবে নিতে পেরেছে? পারে নাই। ফলে, প্রায় সারাটা পৌষ তো সে সুবাসের কথা ভুলেই ছিল। পৌষের মাঝামাঝির পরে ইস্কুল খুলে গেলেও তো ধান টোকানোর কারণে সে ইস্কুলে যেতে পারে নাই তখন, যাদের ধান টোকানো ছিল না- যারা ইস্কুলে গেছে, সন্ধ্যার মুখে ধান টুকিয়ে উঠানে মলন শুরু হলে তাদের কাউকে কাউকে ফিরতে দেখে পূর্ণিমার কি ইস্কুলের কথা মনে পড়েনি? পড়েছে। কিন্তু পেট আগে, পূর্ণিমা জানে, দিদিমা বলেছে। তবু, উত্তরের বাড়ির মেয়েদের ফিরতে দেখে, গোড়াখালের মেয়েদের ফিরতে দেখে তার ইস্কুলের কথা মনে পড়তো, তার সুবাসের কথা মনে পড়ত। কিন্তু সেই কয়েকটা ছোট্ট বিকেলে, সারাটা দিন ধান টোকানোর পরে তার সাবুসের কথা ভাবার সময় থাকতো কই? তখন, সন্ধ্যার আগে শৈব্যা আসলে শৈব্যাকে দিয়ে ইস্কুলের পড়া দাগিয়ে রাখত। মাঝে মধ্যে সেই পড়ায় একটু চোখও বোলাত। আর তা যদি নাও হত তাহলেও তো নন্দকে একটু পড়ালেখা দেখানো লাগত।

নীলিমা এক-আধবার ইস্কুলে গেলেও তা ধরার ভেতরে না। পাঠাশালাই শেষ। বানান করেও সব কিছু ঠিকমতো পড়তে পারে না। তাকিয়ে থাকে। নন্দর এখনও সেই দশা না হলে পড়ালেখায় যা গতি তাতে তা-ই হবে। আজকাল বিড়ি ফোঁকে। তবু দিদিমার কথায় নন্দকে একটু পড়ালেখা দেখিয়ে দেয়ার পরে যেটুকু সময় থাকে সেই সময়ে পূর্ণিমার তো আর সুবাসকে ভাবা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পৌষসংক্রান্তির পরেই সেই দিন নিয়ে তৃতীয় দিন পূর্ণিমা ইস্কুলে গেছে। মাঝখানে একদিন যায়নি, তারপর যেদিন গেছে সেই দিনই তো সুবাস তার পাশে উড়ে এসে পড়ল। আর, সেই যে সুবাস পূর্ণিমাকে বলে গেল সে যায়- সুবাস গেল ঠিকই কিন্তু পূর্ণিমার মন থেকে আর সুবাস কোনোভাবে নামল না। নামল না কী, যেন একদম অন্তরের শেষ কোনায় যেয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকলো। যেন, যেকোনো সময় যেকোনোভাবে সে চাইলেও সুবাসকে মনে মনে এনে হাজির করতে পারে! চাইলে, টুক করে আতা পড়ার মতো সুবাসকে পেড়ে চোখের সামনে ধরতে পারে! চাইলেই, যেভাবে বড়শিতে আদার গেঁথে থির মাঝ পুকুরে ছুঁড়ে দেয়, সেভাবে ছুঁড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে আর যখনই দরকার সেই বড়শি টেনে তুলে ঠিক চোখের সামনে এনে ধরে দেখতে পারে। দেখে..., না সুবাস পূর্ণিমার বড়শির আদার না। পূর্ণিমা হাসে। সুবাসকে সে তো চোখ আর মন থেকে দূরে করে দিতে চাইছিল, তা আর পারলো কোথায়? বরং সুবাস যদি ওই রকমভাবে তার সঙ্গে গেঁথে যায় তাহলে তাকে সে ছাড়ায় কী করে?

পূর্ণিমা সুবাসকে ছাড়াতে চায় না। বরং সুবাসই তো তাকে বলেছে, সে আর পথে পূর্ণিমাকে জ্বালাবে না। সত্যি! সুবাস যদি আর না আসে?

এই প্রথম পূর্ণিমার মনে হয়, এখানে বসে, ঘরের উল্টোদিকে ধান সেদ্ধ দেয়ার নিকানো উঠোনে কড়া রোদের দিকে চেয়ে চেয়ে সোজা খালের ওপারের রাস্তায় চোখ রেখে, মনে হয়, এখন এই রাস্তা দিয়ে যদি সে যাইত! দেখো, আগে সেই লোক কত খালি খালি গেছে আর এখন একবার এমনেও আসে না। না হয় বলেছে, আমারে আর পথে কোনোদিন বিরক্ত করবে না কিন্তু নলিনী মামার কাছে একবার আসলে পারে। আগে এতো সঞ্জয় মামার কথা জিজ্ঞেস করতো, এখন তাও করে না। তা না করুক, তবু একবার যদি সে এই দিকে আসতো?

...

এই সমস্ত ভাবতে ভাবতেই একদিন সত্যি সত্যি সুবাস আসে। সুবাসের দেখা পায় পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা ইস্কুল থেকে ফিরতে ছাড়াভিটা পার হতেই সুবাসকে দেখে। নলিনীদের বাড়ির চারের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। সুবাস ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারে। স্বাভাবিক। যখন সুবাসকে দেখতে পূর্ণিমার মন উথাল হতো না, তখনো তো কতদিন ঐখানে ঐভাবে সুবাসকে সে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। কিন্তু তখন দেখে তো আজকের মতো অবস্থা হয়নি তার। হওয়ার ছিল না। পূর্ণিমা একবারই মাত্র চোখ তুলে সুবাসকে দেখে। এরপর তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। সে পারলে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তাও তো সম্ভব না। এখন মাঘের এই পড়ন্ত বিকেলে এখানে দাঁড়িয়ে সে করবেটা কী? বরং খালের বাঁক ঘোরা এই জায়গায় দাঁড়ালে নীলিমাদের ঘর দেখা যায়। তারপর আর একটু এগোলে আর ঘর চোখে পড়ে না, সঞ্জয় মামাদের কাছারি ঘরে চোখ বাঁধে। আটকে থাকা সেই চোখে সোজা সামনে এনে দেখে, নলিনী মামাদের বাড়ির চারে গোড়া থেকে খুবই দ্রুত সাইকেল চালিয়ে সুবাস তার দিকে আসছে।

সুবাস এইদিকে আসছে... সুবাস আসছে... পূর্ণিমা চেয়ে দেখে। নিশ্চিত তার পাশ থেকে সাইকেল চালিয়ে যাবে। তার পাশ থেকে যাবে সুবাস! কিন্তু এর কিছুই ঘটার আগে, সুবাসের সাইকেল সামনের চারের গোড়ায় থামে। সুবাস সাইকেল চারের খুঁটির সঙ্গে রেখে চার পার হয়ে সোজা সঞ্জয় মামাদের উঠানে দাঁড়ায়। একবারও পূর্ণিমার দিকে চায় না। না চাক, পূর্ণিমা তা চায়ও না। অথচ সঞ্জয় মামার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে ফিরে খালপাড়ের দিকে চেয়ে পূর্ণিমাকে দেখে। পূর্ণিমার হাতে চারের আড়া, নিচে চারের গাছের ওপর পা- সেই পা কাঁপছে, পূর্ণিমা টের পায় তার দিকে তাকিয়ে আছে সুবাস; ফলে, পূর্ণিমা চারের আড়ায় হাত শক্ত করে ধরে তবু তার যেন মনে হয় সেই হাত আলগা হয়ে আসছে, সে নিচে পড়ে যাবে- একগাছা দড়ি হাওয়া মাঘের শীর্ণ প্রায় জলহীন খালের স্রোতে পিনপিন চলা জল- সেই জলের দিকেও তো ভালোভাবে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে না, কোনোভাবেই তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে না, কোনোভাবেই...

চার থেকে নেমে খালের পার ধরে ডাইনের পথটুকু পার হয়ে পূর্ণিমা

যখন উঠানে উঠে আড়াআড়ি ঘরের দিকে হেঁটে যায়, শুধু সেই সময়টুকুতেই সুবাস একবার সঞ্জয়ের ঘরের দিকে চেয়েছিল। পূর্ণিমা ভেবেছে, যাক এখন সঞ্জয় মামা বের হলে হয়। আবার, নিজের ভেতরে সাহসে ভর রেখে ভাবে, যদি কিছু বলতো! এ সময় সুবাস পূর্ণিমার দিকে চায়- পূর্ণিমা উঠানের মাঝ বরাবর পাড়ি দিতে দিতে তখন সুবাস কয়েক কদম হেঁটে পূর্ণিমার কাছে এসে বলে, 'কী-ই কই নাই, আর কতা কব না?'

পূর্ণিমা চুপ।

- 'আইজকেও তো জিগোতি পারতাম-জিগোই নাই-

পূর্ণিমা চুপ।

- 'আচো ভালো'?

পূর্ণিমা চুপ।

- 'এই কয়দিনে আমার কতা একবারও মনে পড়ে নাই?'

পূর্ণিমা চুপ। সুবাসের মুখের দিকে চায়। এক পল... দুই পল চেয়ে থাকে। এরপর প্রায় দৌড়ে ঘরে যায়। তার আগে, ওই মুখে সুবাসের মুখের দিকে চেয়ে একবার হাসে। ওই একবার।

...

এর দিন কয়েক বাদে ফাল্গুনের শুরুতে হাসি এলে, হাসিকে সব কিছু ভাঙিয়ে বলে পূর্ণিমা।

হাসি শুনে, 'দাঁড়াকাকের সাথে লাইন লাগইচো?' বলেই পূর্ণিমার গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

পূর্ণিমাও হাসে।

হাসি বলে, 'তার, কাউয়ার সাতে দেহা করো কী বিলে? না উইড়গা আসে? চিডি দেচে? দেহা হয়? কতা হয়?

পূর্ণিমা হাসিকে সব বলে। এমনকি এর মাঝে ইস্কুলের পিছন পথে মাঠে দিয়ে আসার সময় যে একদিন সুবাস মাঠ ধরে মঘিয়া যাওয়ার সময় কথা হয়েছিল, তাও বলে।

এইসব কথা বলতে বলতেই যেন ওই যে হাসিদি যার গুণের 'গ'ও নাই সেই দেখো পূর্ণিমারে কীসব সত্যি কথা শোনাল। পূর্ণিমাও তো তা সবাই জানতো। ভুলে গেছিল, তাও নয়। তবু, তার ভেতরে সুবাসকে ভেবে নিতে নিতে এ সমস্ত কথা সে কোনো ভুলে যেমন ভুলে গেছিল।

হাসি পূর্ণিমার হাত ধরে ঘর থেকে পূর্বের খালপাড়ে ছোট পুকুরের পাড়ে গেলে হাসি বলে, 'ও পুন্নি, সুবাসরে কইচো- মাসিরে জামাই নে না?'

হঠাৎ এই প্রশ্নে একটু থতমতই খায়, 'কই নাই' পূর্ণিমা বলে, 'তয় জানে মনে কয়-'

- 'কী বিলে বুঝলি?'

- 'না, না জানলে'-

- 'তবু তুই কবি না?

- 'সময় পাই নাই।'

- 'ছাগলের মতো কথা কইস না।'

- 'কেন।'

- 'যহনি সময় পাবি- কবি না? দিদিমার সাথে দাদুর বনিবনা নাই- দাদু ছোট দিদিরে নিয়া থাহে। কবি, নীলি কানে সোনে না, বোদ নাই। কবি, মাসিরে জামাই নে না। তোরা মামাবাড়ি থাহো- দিদিমার ধারে- এই সমস্ত-পীরিত অত সোজা জিনিস না!'

হাসির মুখের দিকে তাকিয়ে পূর্ণিমার চোখে জল। জলভরা চোখে পূর্ণিমা হাসি মুখের ঝাপসা চায়, 'হাসিদি কেউ তো আমারে কোনোদিন ভালোবাসে নাই- ওই মানুষ এট্টু ওইভাবে চাইচে- সেইতেই তো আমি আহাশ হাতে পাইচি- সেরে আবার ওই সমস্ত কইলে যদি চইলগা যায়?'

- 'যাবে কোতায়?' হাসি পূর্ণিমার মাথায় হাত বোলায়, 'সেইর পরও থাকলে বুজবি তোরে ভালোবাসে-'

হঠাৎ মুহূর্তেই, নীলিমার বয়সী হাসিদি পূর্ণিমার কাছে অনেকখানি বড় হয়ে গেলে পূর্ণিমা চেয়ে চেয়ে মঞ্জুমাসির গুণহীন মেয়ে হাসিকে দেখে।

...

কিন্তু হাসির বলা এই সমস্ত কথা আর পূর্ণিমার নিজের জমানো সমস্ত কথা সুবাসকে বলার জন্যে যে ফুরসত চাই, ফুরসত পূর্ণিমা পায় কোথায়? সুবাসরে বলার জন্য সে সুযোগ খোঁজে, সুবাসের পথ চেয়ে বসে থাকে, সুবাসকে পেলে কী কী বলবে সেই সমস্ত ভাবে কিন্তু এখন আর কোনোভাবেই সুবাসের সঙ্গে পূর্ণিমার দেখা হয় না। অথচ আগে কত সহজে দেখা হত। ইস্কুল ছুটির পর কোত্থেকে উড়ে সুবাস এসে হাজির হত, নলিনী মামাদের বাড়িতে আসত ছাড়াভিটার পথে তাকে আটকাতে।

এর ভেতরে শুধু প্রফুল্লর এঁকে-দেয়া গোলাপ ও সুবাসকে পূর্ণিমা রুমালে বসাতে পেরেছে। তাও পারতো না যদি বাড়ি থেকে আসার সময় হাসি তার জন্য একখন্ড কাপড় না এনে দিত। আনার পরে হাসি কাপড় খন্ড পূর্ণিমাকে দেখিয়েছে, পূর্ণিমা দেখে মুখ টিপে হেসেছে। কাপড়ের টুকরোকেই হাসি রাখতে বলেছে, এমনকি পূর্ণিমা ওই কাপড়ে সুইসুতো জুড়লেও। মাঝেমধ্যে বিকালে হাসি আর পূর্ণিমা গল্প করতে করতে যখন ফাঁকা মাঠের কোণায় কোনো আমগাছের তলে বসে মাঠের দিকেই চেয়ে থাকে, সে সময় হাসি নিজের জন্য নমস্কারের ভঙ্গিতে দু'হাত এক করে জোড়ালাগানোর নিচে স্বাগতম লেখা কাপড়টাকেও আনে পূর্ণিমার জন্য আনা রুমালের কাপড়ের সঙ্গে। সেই কাপড়ে সুবাসের নাম ও চারপাশে ফুল লাল-সবুজ-হলুদ ও নীল সুতায় তুলতে তুলতে হাসির পাশে বসে পূর্ণিমা ওই কাপড়েই সুবাসকে দেখে। সুবাসের মুখ দেখে, সাইকেলে ছুটে আসছে সুবাস,... মাথায় এত লম্বা সুবাস- সুবাস পূর্ণিমার কাছে দাঁড়ালে সে কোলের কাছে দাঁড়িয়েছে- সেখান থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে সুবাসের মুখ দেখে নিতে ঘাড় উঁচু করে প্রায় আকাশ দেখে নিতে হয়। এ সময়, নিজের আনাড়ি হাতে স্বাগতম লেখায় হাত থামিয়ে হাসি বলেন, 'এহান দিবি কবে'-

যেন, অনেক কাজের ক্লান্তির পরে অনেককাল বাদে এই নিয়ে কথা বলারও ফুরসত পাইল পূর্ণিমা সেই ভঙ্গিতে হাত গুটিয়ে কোলের কাছে নিয়ে সে চোখ গাঢ় করে হাসির দিকে চায়। সে চোখে লজ্জা কিছু আছে, অনিশ্চয়তাও। হাসির চোখে চেয়ে সেই লজ্জা দূর করার কোনো ইচ্ছাও তার চোখে নাই তবু অমন মাখোমাখো লজ্জায় অনিশ্চয়তা নিয়েই পূর্ণিমা বলে, 'সেয়া জানি না।'

- 'কেন, তোর সাতে কতা হয় নাই?'

- 'একদিন এট্টু সোমায় হইচেল'-

- 'তার?'

- 'সেদিন কিচু কইতে পারি নাই'।

- 'কোতায় দেহা হইচে?'

- 'ইস্কুলদা আসতে সোমায়, পতে'-

- 'তার'।

- 'হয়, ওই পতে কতা কাওয়া যায় নাকী?'

- 'সেইয়ার পর আর দেহা হয় নাই?'

- 'না।'

- 'কেন?'

- 'সেয়ার দাদাবাবুরে নিয়ে গেল বাগেরহাট- সোয়ার অপারেশন- এই সমস্ত'-

- 'ও। দাদাবাবুর ওসুক হওয়ার আর সোমায় পাইল না। কী? আমি তো বাড়ি যাইয়া কিচু শোনলাম না।'

- 'কী এপেনডিচ না কী কয়'-

- 'যেদিন দেহা হইচে- সেইয়ার পর তুই আর দেহা করার কথা কিচু কও নাই?'

- 'কইচি'-

- 'তার, সে কী কইচে?'

- 'কইচে নীলের মেলায় আসপে'-

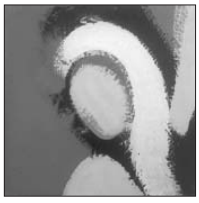

৫.

চৈত্র সংক্রান্তিতে সরকারি পুকুরপাড়ে নীলের মেলায় পূর্ণিমার সাথে দেখা হয় সুবাসের।

এই মেলার পরদিন থেকে পহেলা বৈশাখে এই ইউনিয়নজুড়ে শুরু হবে বৈশাখী মেলা। তার আগে বছরের শেষ দিন উদ্‌যাপনে এই মেলায়ও উৎসাহের কমতি থাকে না। তবে, বৈশাখী মেলায় বসে ইস্কুলের মাঠে- সেই

মাঠ বড়, মেলা বড়, সেই মেলার উৎসাহ আর আয়তনের সঙ্গে এই মেলা মেলে না। সে জন্যেই হয়তো পূর্ণিমা খুব সহজে সুবাসকে খুঁজে পেয়েছে, সুবাস দেখা দিতে পেরেছে পূর্ণিমাকে। কিন্তু এই মেলার যা আয়তন, যা লোক সমাগত তাতে তো এইটুকু ফুরসত নেই- এত মানুষের ভিড়ের ভেতরেই মানুষের ভিড় থেকে তারা আলাদা হতে পারে। এমনকি হাসির সমস্ত তৎপরতার পরেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। হওয়ার কথাও না। নন্দ আছে, নীলিমা আছে, হাসির ভাই পার্থ আছে, আশপাশের বাড়ির মামারা আছে মাসিরা আছে- এসব মানুষের সামনে হাসি তো এটুকু সুযোগ করে উঠতে পরে না, যে সুযোগে পূর্ণিমা কয়েক দন্ড সুবাসের সাথে কথা বলে।

ফাঁকে একটা ময়রার দোকানে সুবাসের সঙ্গে হাসি আর পূর্ণিমা ঢুকলে সেখানে কোত্থেকে নন্দনও আসে। সেখান থেকে বের হলে নন্দ হাসির কাছে জানতেও চায়, সুবাসকে সে চেনে কীভাবে? তাও বলা গেল সুবাসের বড়দির শ্বশুরবাড়ি হাসিদের বাড়ির কাছে। তবু নন্দ পূর্ণিমার আচরণে কিছু বুঝে ফেলে? দিদিমাকে তা জানাতে এক দন্ড সময় লাগবে না। একটু আগে পূর্ণিমা দিদিমাকে দেখে এসেছে পুকুরের ওই পাশে মাটির হাঁড়িকুড়ির দোকানে। নন্দ শুধু সেখানে যেয়ে খবরটা বলবে। তারপরই দিদিমা এসে পূর্ণিমাকে গালাগালি করে বাড়ি চলে যেতে বলবে। তখন? ওই মিষ্টির দোকানের সামনে জিলাপি ভাজার তাওয়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যখন পার্থ এসে নন্দনকে নাগরদোলায় চড়ানোর কথা বলে নিয়ে যায়, তখন যেন এক মুহূর্তে অনেকখানি সময়ের ফুরসত জোটে। হাসি পূর্ণিমাকে নিয়ে আবার মিষ্টির দোকানে ঢোকে, সাথে সুবাস। এর পর তারা দু'জন পেছনের ফাঁকা দিয়ে পগারের পাশে যেয়ে দাঁড়ায়। হাসি ওই ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে সুবাসকে ডাকে। সুবাস দোকানের ভেতরে দাঁড়িয়ে দোনামোনা করে। সামনে চায়। তারপর সেও পেছনে যেয়ে হাসি আর পূর্ণিমার মাঝখানে দাঁড়ায়, হাসি আবার সামনের দিকে আসতে আসতে পূর্ণিমাকে অভয় দেয়, 'তোরা থাক', বলে সুবাসের দিকে চায়, 'থাহেন', এরপর আবার হাসির দিকে, 'ভয় নাই, আমি আচি- সবতা কইস।'

হাসি সামনে চলে যেতেই সুবাস বলে, 'মেলা কতা?'

পূর্ণিমা চুপ। মুখময় মাখানে লজ্জা নিয়ে নিজের খাটো শরীরের চোখ তুলে একবারই লম্বা সুবাসের মুখের দিকে তাকায়। মুখে কথা নাই। সেই চোখ নেমে যেত সুবাস আবার বলে, 'মেলা কতা?'

পূর্ণিমা কিছুই শোনো না। সুবাসের জিজ্ঞাসার মেলা কথা মুহূর্তে মেলার কথা হয়ে কানে বাজে। পূর্ণিমা না বুঝে আবার সুবাসের চোখে তাকায়- কত লম্বা মানুষটা। কতা লম্বা- পার্থর চেয়েও যেন হাতখানেক। উপরে চেয়েও যেন চোখে ঠিকমতো দেখা যায় না। এর ভেতরেই ওই কথার অর্থ পূর্ণিমা ধরতে না পেরে অথবা তার যেন এই মুহূর্তে কিছুই বলারই নাই তো সে সুবাসকে কীই-বা বলে, 'আপনের সাইকেল কই?'

সুবাস মাথাটা নিচে রেখেই এক পলক অবাক চোখে পূর্ণিমাকে দেখে মাথা তুলে সাইকেল দেখায়, 'ওই যে বাইরের কোনায় বেড়ার সাতে বান্দা।'

এ সময় তারা কাপড়ের বাইরে থেকে টের পায় দোকানে খদ্দের ঢুকছে। ফলে, এখন কথা কওয়া যতটা সমস্যার তারচেয়ে পূর্ণিমার জন্য ভয়ের। পূর্ণিমা চোখ কাতর করে সুবাসের দিকে চাইলে সুবাস পূর্ণিমার পাশ থেকে সামনের দিকে হেঁটে পরের দোকানটার পেছনে দাঁড়ায়, 'কী কবা কও- এহোন তুমি বেশিক্ষণ থাকলে কেডা দেখে- তার আর এক সমস্যা- শ্যাষে ইস্কুলে যাওয়াই বন্দ'-

পূর্ণিমা হঠাৎ বলে, 'কোনও কতা নাই-

সুবাস অবাক, 'তয়?'

- 'অইন্যদিন কব।'

- 'এহোন কও'-

- 'ওই কোনার দিক লয়েন'-

হ্যাঁ, কোনার দোকানটার পেছনে জায়গা বেশি- পগারটা ওখানে ঘুরে ডাইনের দিকে গেছে। ফলে, ওই কোনাকুনি আড়াআড়ি জায়গাটা একমাত্র মাঠের কিছু অংশ দিয়ে ছাড়া দেখাও যায় না। তাছাড়া, হাসি যদি আগের দোকানের পেছন থেকে গলা বাড়িয়ে ডাকে তাহলে পূর্ণিমা এসে ওই দোকানের থেকেই বের হবে, সুবাস মাঠের দিকে চলে যাবে।

এখানে দাঁড়াতেই সুবাস বলে, 'কও'-

- 'খালি কও- কও'-

- 'না কেডা না-কেডা দেহে'-

- 'ওই তো মার কতা'?

- 'কী'?

পূর্ণিমা খানিক দম নেয়। নিজেকে সামলে নিতে শ্বাস টানা একটু শব্দও হয়। এরপর, ওই টানা শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নামানো গলায় বলে, 'আমরা দিদিমার ধরে থাহি- মায়রে বাবা নেনা- দিদির

- 'আমি সব জানি'-

পূর্ণিমা কিন্তু অমন এক শ্বাসে কথাগুলো বলতে চায় নাই। নিজেকে লুকাতে ওইভাবে বলা ছাড়া তার উপায়ও ছিল না। কিন্তু সুবাস যখন মুহূর্তে তার কথা ঢেকে দিয়ে সব জানার কথা জানায়, তখনই পূর্ণিমা ধন্ধে পড়ে সুবাসের মুখে চেয়ে বলে, 'তবু আমার তো সব জানানো-

- 'হইচে- আমি জানি কইলাম না'-

এই সময় ওই কোনায় প্রথম মিষ্টির দোকানের কোল ঘেঁষে বসা জুয়ার কোর্টে হাতাহাতি শুরু হলে, আগের মিষ্টির দোকানের পেছনে গলা বাড়িয়ে হাসি বলে, 'এইদিকে আসিস না- ওই দিক যা। তাড়াতাড়ি!'

হাসির গলার উৎকণ্ঠায় তারা দুইজন পগারের পাশ ঘেঁষে মাঠে নামে। মাঠের কোনায় একটা ভাঙা গড়ার পাশে কাপিলার কচাগাছে আটকানো সুবাসের সাইকেল। সুবাস সাইকেল খুলে উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়াতেই পূর্ণিমা বলে, 'আপনে কিচু কইলেন না।'

সুবাস পূর্ণিমার চোখে চায়। গলা তুলে জুয়ার কোর্টের হাতাহাতি লক্ষ করে। পূর্ণিমাও সেদিকে একবার তাকায়। তারপর সুবাসের দিকে তাকিয়ে চেয়ে দেখে, সুবাস মাথা তুলে আছে। পূর্ণিমা সেদিকে তাকালে দেখে, হাসি এই কোনার মিষ্টি দোকানের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলছে, 'ওইদিক যা-'

ফলে, সুবাস কেন পূর্ণিমার দিকে চেয়েছিল তা আর পূর্ণিমার দেখা হলো না। এমনকি তার প্রশ্নের উত্তরও দিল না সুবাস। এর ভেতরে হাসির কথামতো তারা মাঠ বেয়ে হাঁটা ধরলো, ফাটা মাঠে সুবাস হাতেধরা সাইকেলের লাফ সামলে যখন পূর্ণিমার দিকে আবার আগের মতো চেয়ে উত্তর দেবে- সেই সময়ে পূর্ণিমা আবার ওই একই কথা বলে, 'আপনে কিচু কইলেন না?'

সুবাস গাঢ় বলায় বলে, 'কওয়া লাগবে?'

পূর্ণিমার ধন্ধ বাড়ে। চোখের কাতরতাও। সেই সাথে সুবাসের পাশে হাঁটায় সে পিছিয়ে পড়ছে তাও সামলে নিতে তাকে পায় জোর আনতে হয় কিন্তু সেই জোরও যদি হঠাৎ এই ফাঁকা মাঠের কোল বেয়ে উঠে আসা বলেশ্বরের বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়, যাক। তাকেও উড়িয়ে নিয়ে গেলে হয়, তাও যাক। তবু তার সুবাসের কথা শোনা চাই। পূর্ণিমার পিছনে ফিরে দেখে হাসি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আর তারা এই মাত্র মাঠ ছেড়ে পাশের বাড়িঘর পেছনে ফেলে কুচিবগার রাস্তায় উঠেছে। এই রাস্তা ধরে সোজা গেলে খেয়া- ওপার গেলে শেখমাটিয়া তারপর... দীর্ঘ ইউনিয়ন তারপর শ্রীরামকাঠি... তারপর পূর্ণিমাদের বাড়ি... আর এখন পূর্ণিমার পাশে সুবাস।

পূর্ণিমা পিছনে ফিরে দেখে হাসিকে আর দেখা যায় না। মেলাও না। শুধু শব্দ আসছে। এখনো যদি সুবাস বলত তবু সে এই সোজা নেমে মাঠ ধরে চলে যেতে পারতো। ঘরে যেয়ে তো দেখবে মা মাঠের দিকে চেয়ে আছে- একবার মেলার দিকে একবার বলেশ্বরের দিকে... এই চিন্তায়ও বলেশ্বর হয়ে দুইপাশের ফাঁকা মাঠ বেয়ে উঠে আসা বাতাসে সকল চিন্তা উল্টে যেতে লাগলে পূর্ণিমার মাথায় আবার আগের চিন্তা ঘোরে। পূর্ণিমা অনেকটা হিক্কা-ওঠার মতো একই স্বরে বলে, 'আপনে কিচু কয়েন?'

- 'কব আর কী? পারলে সাইকেলে ওডো- দিদির বাড়ি নিয়া যাই- কাইল সহালে বাড়ি নিয়া যাবহানে'-

এই শুনতে চেয়েছিল পূর্ণিমা!

সুবাসের দিকে একপলক চেয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে পূর্ণিমা আবার নিজেতে ফিরে আসে।

নিজের সমস্ত জড়তা ও শঙ্কা উবে গেলে এতক্ষণ হাতে থাকা রুমালখানা আড়ষ্ঠ হাতে সুবাসকে দেয়, 'এই হান আপনার জইন্যে খাড়ছেলাম।'

রুমালখানা সুবাস হাতে নিলে একটু আগে ওই কথা শোনার দমকে পূর্ণিমা সুবাসের সাথ-ধরে হাঁটতে থাকে।

যেন, হাঁটছে বহুকাল... ■